প্রশ্নবিদ্ধ শিক্ষাক্রম

জাতি ধ্বংসের হাতিয়ার

?

প্রশ্নবিদ্ধ শিক্ষাক্রম জাতি ধ্বংসের হাতিয়ার

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
www.shibir.org.bd

কেন্দ্রীয় সভাপতির বক্তব্য

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

মানবজীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয় গোটা জাতিসত্তার কাঠামো। কোনো জাতির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির নিয়ামক হলো শিক্ষা। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ, জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে চরিত্র গঠন, জীবনের সকল ক্ষেত্র ও বিভাগে নেতৃত্বদানের উপযোগী ব্যক্তিত্ব তৈরি কেবল উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। সমাজ গড়ে ওঠে মানুষ নিয়ে, আর শিক্ষাঙ্গনকে বলা হয় মানুষ গড়ার কারখানা। তাই শিক্ষা হলো জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রধান উপকরণ।

বাংলাদেশ কেবল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র নয়; জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রও বটে। এ দেশের জাতীয় সংস্কৃতির মূল প্রবাহ ইসলাম। ফলে ইসলামকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের দীর্ঘকালের ইতিহাস নির্মিত হয়েছে। গণমানুষের জীবনে শিক্ষাকাঠামো থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকনির্দেশনা ছিল বীরবিক্রমে হাজির।

বাঙ্গালা ভূমির দীর্ঘকালের শিক্ষা, প্রশাসন ও ইনসাফময় শাসনের সোনালি অতীত তসবির দানার মতো রশি ছিঁড়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ভেতর দিয়ে। উপনিবেশ এখানকার মুসলমানদের সাথে দীর্ঘকাল ধরে লেপ্টে থাকা সম্পর্কের মূলে কুঠারাঘাত করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তার নিজস্ব ইহজাগতিক সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্রমের আবির্ভাবের ফলে ধর্মবিশ্বাস থাকার পরও জ্ঞানগত দীনতায় শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে

মুসলমানদের বহুদূরে চলে যেতে হয়েছে। ধর্মসংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রমের পরিবর্তে উদ্ভূত হয়েছে এমন শিক্ষাদর্শন, যেখানে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয়, স্রষ্টার ধারণা হয় বিবর্জিত। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনে মুসলিম মননে বিশ্বাসের প্রতিফলন না ঘটে তাদের সৃষ্টিশীল ক্ষমতা লোপ পায়। উপমহাদেশের রাজার আসনে বসে ৫০০ বছর শাসন করা জাতির ১৭৫৭-পরবর্তী সময়ে একটি কেরানির চাকরি জোটাতেও বেগ পেতে হয়েছে। 'বাংলাদেশ' ভূখণ্ড একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও আদতে এই রাষ্ট্র তার ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স থেকে এখনও বের হয়ে আসতে পারেনি। প্রশাসন থেকে শুরু করে আইন-আদালত সব জায়গাতেই ঔপনিবেশিক ছাপ স্পষ্ট। ম্যাকলেরা এখানেই যেন সফল। তারা চলে যাওয়ার পরও এই ভূমির সন্তানরা সেই ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স মুখে করে সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে। ফলে নামকাওয়াস্তে মুসলিম হলেও কাজেকর্মে তারা ঔপনিবেশিক মানসিকতার গোলাম হয়ে রয়েছে।

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর দেশের জনসাধারণ আশা করেছিল, এ দেশের আইন, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি পাবে একটি আদর্শিক ও স্বতন্ত্র কাঠামো। কিন্তু তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী সামগ্রিক দিক থেকে এ দেশকে জবরদখল করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, রাজনৈতিক মতামত দমন ও শিক্ষানীতিতে আধুনিকতার নামে ইসলামবিমুখতার অনুপ্রবেশ ঘটানোর মধ্য দিয়ে বাম ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তার প্রসারে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো বরাবরই ব্যস্ত থেকেছে। এর অংশ হিসেবে ১৯৭২ সালে গঠন করা হয় ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন। এই কমিশন একটি আদর্শ ও নৈতিকতাহীন, নাস্তিক্যতায় পরিপূর্ণ জাতীয় আদর্শবিরোধী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করেছিল। দেশে নাস্তিক্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক মনন তৈরি করা ছিল ওই শিক্ষাক্রমের একমাত্র উদ্দেশ্য। অথচ ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গঠিত মুজিবনগর সরকারের মেনিফেস্টোর কোথাও নতুন প্রতিষ্ঠিত দেশের মৌলিক গঠনতান্ত্রিক নীতি হিসেবে না

'বাংলাদেশ' ভূখণ্ড একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও আদতে এই রাষ্ট্র তার ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স থেকে এখনও বের হয়ে আসতে পারেনি। প্রশাসন থেকে শুরু করে আইন-আদালত সব জায়গাতেই ঔপনিবেশিক ছাপ স্পষ্ট। ম্যাকলেরা এখানেই যেন সফল। তারা চলে যাওয়ার পরও এই ভূমির সন্তানরা সেই ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স মুখে করে সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে। ফলে নামকাওয়াস্তে মুসলিম হলেও কাজেকর্মে তারা ঔপনিবেশিক মানসিকতার গোলাম হয়ে রয়েছে।

> সরকার বিভিন্ন শ্রেণির বইয়ে ধর্মহীন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠান চালু করে আগামী প্রজন্মকে অধার্মিক, অনৈতিক ও পাপাচারে নিমজ্জিত নাগরিক তৈরির নীলনকশা বাস্তবায়ন করছে। ফলে নতুন প্রজন্মের বেড়ে ওঠা যে একটি অসুস্থ সংস্কৃতি ও ধর্মবর্জিত ব্রাহ্মণ্যবাদী রূপকল্পের মধ্যে গড়ে উঠবে, তা স্পষ্ট। নতুন প্রজন্মের কাছে নিজস্ব আত্মপরিচয়ের সংকট (Identity Crisis) ভয়াবহ আকারে প্রতিফলিত হবে তা আরও স্পষ্ট হচ্ছে।

'সেক্যুলারিজম' ও 'সমাজতন্ত্র' উল্লেখ করা হয়েছে, না বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে মুসলিম জাতিসত্তার বিপরীতার্থক হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৭২-এর সংবিধান রচনার সময় মৌলিক গঠনতন্ত্র হিসেবে সেক্যুলারিজম ও সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তি জনগণের রায় অনুযায়ী ছিল না। এটা ছিল মূলত শাসকগোষ্ঠী দ্বারা আরোপিত। এখানকার শিক্ষাক্রমে তারই ধারাবাহিকতায় সেক্যুলারিজম ও সমাজতান্ত্রিক ভাবাপন্ন মনন তৈরির উদ্যোগ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জাতিসত্তাবিরোধী একটি ষড়যন্ত্র। এটা থেকে এখন পর্যন্ত এই জাতির মুক্তি মেলেনি। কুদরত-ই-খুদা কমিশন-পরবর্তী বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবনায় ইসলামি ভাবাদর্শের ছোঁয়া থাকলেও সেগুলো খুদা-শিক্ষানীতি থেকে পুরোপুরি বের হয়ে আসতে পারেনি। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে ফের তারা নতুন প্রজন্মকে বিপথগামী করার নীলনকশা বাস্তবায়নে মত্ত হয়ে পড়ে, যার লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত দেশবাসীকে আজও দেখতে হচ্ছে। নাস্তিক্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ভিনদেশি কুচক্রীমহলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শিক্ষাক্রমে ইসলামি আদর্শ মুছে দিয়ে অশ্লীলতা, পৌত্তলিকতার শিক্ষা সংযুক্ত করছে জনসমর্থনহীন আওয়ামীলীগ সরকার। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নের মাধ্যমে পুনরায় জীবিত করার চেষ্টা হয় ১৯৭২-এর শিক্ষা কমিশনের জাতি গঠনের অসার প্রস্তাবনা। ২০২৩ সালে প্রণীত শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে তা পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকার তার শাসনতান্ত্রিক যাত্রা থেকেই প্রাক-প্রাথমিক হতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নতুন শিক্ষাক্রমের চূড়ান্ত রূপরেখায় ধর্মশিক্ষা বাদ দিয়ে ইসলামবিদ্বেষী গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ সংযোজন করে আসছে। এর ধারাবাহিকতা ২০২০ সালের নতুন শিক্ষাক্রমেও দেখা গেছে। কোমলমতি মুসলমান শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজাতীয় সংস্কৃতি, ভিন্নধর্মীয় আচার-আচরণ ও কুসংস্কার সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। ইসলাম ধর্মবিষয়ক এবং মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি উদ্দীপনামূলক গল্প-রচনা ও কবিতাসমূহ বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে নাস্তিক্যবাদ

ও হিন্দুত্ববাদের প্রতি উদ্দীপনামূলক বিভিন্ন রচনা, গল্প ও কবিতা একতরফাভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সরকার বিভিন্ন শ্রেণির বইয়ে ধর্মহীন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠান চালু করে আগামী প্রজন্মকে অধার্মিক, অনৈতিক ও পাপাচারে নিমজ্জিত নাগরিক তৈরির নীলনকশা বাস্তবায়ন করছে। ফলে নতুন প্রজন্মের বেড়ে ওঠা যে একটি অসুস্থ সংস্কৃতি ও ধর্মবর্জিত ব্রাহ্মণ্যবাদী রূপকল্পের মধ্যে গড়ে উঠবে, তা স্পষ্ট। নতুন প্রজন্মের কাছে নিজস্ব আত্মপরিচয়ের সংকট (Identity Crisis) ভয়াবহ আকারে প্রতিফলিত হবে তা আরও স্পষ্ট হচ্ছে। এটা এদেশীয় সচেতন জনসাধারণের প্রতি মহাকালের জন্য অশনিসংকেত। নিজের ধর্ম, আদর্শ ও স্বকীয়তা ভুলে গিয়ে সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়া, জিনা-ব্যভিচার, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দুর্নীতি ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে এক নোংরা জীবনের দিকে যাত্রা করবে আগামী প্রজন্ম। ফলে এই নতুন শিক্ষাক্রমের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে নাগরিক সচেতনতা বাড়ানো আবশ্যক হয়ে পড়েছে। দেশকে বাঁচানো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি দেশের সন্তানদের বাঁচানো আরও বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ২০২৩ সালের নতুন শিক্ষাক্রমে প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে যে ধরনের পাঠ হাজির করা হয়েছে, তা যদি পরবর্তী বছরগুলোতে পরিবর্তন হতে যাওয়া বইগুলোতেও সমানভাবে উপস্থিত থাকে, তাহলে এই জাতি খুব শিগগিরই পথ হারাতে বাধ্য হবে। পরাধীনতার শেকল তাদের নিজভূমে পরবাসী করে তুলবে। তাই সর্বশেষ প্রণীত শিক্ষাক্রম বাতিলের ডাক দেওয়ার পাশাপাশি দেশীয় মানুষের জাতিসত্তার সাথে সম্পর্কিত, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ঈমান-আমল ও আখলাকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষানীতি প্রণয়নের জোর দাবি জানাচ্ছি। দেশের সাধারণ নাগরিক সমাজের মধ্যে সেই লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও নয়া পাঠ্যক্রমের ভয়াবহতা মানুষের সামনে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরতে বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রশিবির বুকলেট তৈরির উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এর সাথে সম্পৃক্ত ভাইদের শ্রমকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উত্তম প্রতিফল দিয়ে কবুল করে নিন, আমিন।

মা'আসসালাম

রাজিবুর রহমান
কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

ভূমিকা

শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা একটি দেশ ও জাতির মৌলিক জীবনবোধ, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি-কৃষ্টি, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দর্শনের ওপর গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা মূলত উপমহাদেশের মুসলিম সুলতানি আমল, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের ফল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর পতনের পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চলে মুসলিম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। এমনকি ব্রিটিশরা কোম্পানির মাধ্যমে বাংলা দখল করে নিলেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার পূর্বের ধারা অব্যাহত ছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে অনেকগুলো শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। সকল শিক্ষা কমিশনের একটিই উদ্দেশ্য ছিল— ১৮৩৩ সালে লর্ড ম্যাকলে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন। ম্যাকলে শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবনা ছিল উপমহাদেশে এমন কিছু মধ্যস্থতাকারী তৈরি করা— যারা রক্তে-মাংসে হবে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, চিন্তাচেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ব্রিটিশ। হয়েছিলও ঠিক তা-ই। ম্যাকলের সুপারিশকৃত শিক্ষাব্যবস্থাই উপমহাদেশে স্থায়ীভাবে চালু হয়। ৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও ব্রিটিশদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা তার ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য বজায় রাখে।

পাকিস্তান আমলে মাওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বাধীন শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটি থেকে এয়ারমার্শাল নূর খান শিক্ষা কমিশন পর্যন্ত কোনোটিই পাকিস্তান আমলে বাস্তবায়ন হয়নি। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন এবং এরপর মজিদ খান শিক্ষা কমিশন, শামসুল হক শিক্ষা কমিশন, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০৯ এবং জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণীত হয়। সর্বপ্রথম গঠিত ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে ধর্মীয় শিক্ষাকে চূড়ান্ত অবহেলা করা হয়। পরবর্তী শিক্ষানীতিগুলো কুদরত-ই-খুদা কমিশনকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে, তাই সেগুলোর ক্ষেত্রেও ধর্মকে গুরুত্বহীন করার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। সর্বশেষ ২০১০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ২০২০ সালের শিক্ষাক্রম যেন পূর্বের সকল ইতিহাস ছাড়িয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে দীর্ঘকালের শিক্ষাকাঠামোর রূপ ও দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বর্তমান নিবন্ধে শিক্ষাব্যবস্থার দীর্ঘ ইতিহাস টেনে আধুনিক শিক্ষাক্রমের সাথে একটি পর্যালোচনা হাজির করা হয়েছে। এতে আধুনিক শিক্ষাকাঠামোর রূপ তার সৃষ্ট ক্ষত নিয়ে স্পষ্ট হবে এবং শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে একটি সুন্দর দেশ ও জাতি গড়ে উঠবে।

বাংলার ইতিহাসে মুসলিম শিক্ষাক্রম

উপমহাদেশের মুসলমানরা খেলাফত যুগের খ্যাতনামা পূর্বসূরিদের নিকট থেকে একটি মূল্যবান শিক্ষাপদ্ধতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। মুসলমানরা যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই তারা শিক্ষা ও জ্ঞানের ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে গেছে। রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে এ উপমহাদেশে তারা তাদের শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারাও নিয়ে আসে। এন. এন. ল লিখেছেন–

> ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ভারত আক্রমণ কেবল একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটি এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে।[১]

প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানরাই এ উপমহাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বজনীনতা ও উদারতার আদর্শ তুলে ধরে। এমনকি, ভারতে মুসলমান সুফি দরবেশগণও– যারা কেবল মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানে নিয়োজিত ছিলেন– তারাও তাদের শিষ্যদের শিক্ষার প্রতি জোর দিয়েছেন এবং যথার্থভাবে শিক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে নিজেদের শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি। শেখ আখী সিরাজ উসমানকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করার সময়ে শেখ নিজামউদ্দিন আওলিয়ার মন্তব্য এর সাক্ষ্য বহন করে।[২]

প্রাথমিক শিক্ষাক্রম

ত্রয়োদশ শতকে সুলতানি শাসনের গোড়াপত্তন হয়। সুলতানি আমলে বাংলায় শিক্ষার তিনটি স্তর ছিল : প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চস্তর। প্রাথমিক শিক্ষা মসজিদসংলগ্ন মক্তবে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, মন্দিরে, অভিভাবক বা শিক্ষকের গৃহে, পথিকের বিশ্রামগৃহে, দোকানের কোণে কিংবা গাছের নিচে প্রদান করা হতো। মুসলিম সমাজের প্রতিটি শিশু চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে উপনীত হলে তাকে সুন্দর পোশাকে সাজিয়ে পরিবারের সব সদস্য ও অন্য স্বজনদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদানের সূচনা করা হতো। শিশুকে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করানোর চেষ্টা করা হতো। শিশু পড়তে না চাইলে তাকে অন্তত 'বিসমিল্লাহ' উচ্চারণ করানোর প্রথা ছিল। প্রাথমিক অবস্থায় জোর দেওয়া হতো বিশুদ্ধ উচ্চারণের দিকে। পরবর্তীকালে ধারাবাহিকভাবে পান্দনামাহ, আন্দনামাহ, গুলিস্তাবুস্তা ইত্যাদি ফারসি শিক্ষার গ্রন্থ পাঠ শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক ছিল। তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয় ফারসি ভাষায় প্রকাশ করতে শেখানো হতো। পাশাপাশি ছাত্রদের ইউসুফ-জুলেখা, লাইলি-মজনুর কাহিনি, সিকান্দারনামাহ, আলেকজান্ডারের বিজয়ের ইতিহাস ইত্যাদি অধ্যয়ন করানো হতো। প্রাথমিক পর্যায়ে একজন শিক্ষার্থী প্রথমে ফারসি নাম, পরে আরবি এবং তারপর অন্যান্য ভাষায় নাম লেখার অভ্যাস করত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ফারসি-আরবির

---

১. *Promotion of Learning during Mohammedan Rule*, London, 1916, page : 14

২. এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃষ্ঠা : ১৮৭।

পাশাপাশি বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রচলন ছিল। বাংলা বহু মুসলমানের মাতৃভাষা ছিল বলে বাঙালি মুসলমানরা মাতৃভাষাকে অবহেলা করতে পারেনি। বহিরাগত মুসলমানরাও বাংলা ভাষা এবং এ দেশকে নিজের দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছিল।[৩]

মুসলিম বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ প্রচলন সম্বন্ধে উইলিয়াম এডামের তদন্ত রিপোর্ট থেকে মোটামুটি অনুমান করা যায়। যদিও এটি ব্রিটিশ আমলের প্রকাশিত রিপোর্ট। বাংলার শিক্ষার অবস্থা তদন্তের পর এডাম তার রিপোর্টে বলেন— ৪০,০০০,০০০ (চার কোটি) ছাত্রছাত্রীর জন্য বাংলা ও বিহারে প্রায় ১,০০,০০০ (এক লাখ) প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল; ফলে সেখানে স্কুলে ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সের ৩০০ জনেরও অধিক অধ্যয়নরত ছেলেমেয়েদের জন্য একটি গ্রাম্য বিদ্যালয় চালু হয়ে থাকবে। তিনি মন্তব্য করেন, তার হিসাব কতগুলো অনির্ভরযোগ্য উপকরণের ওপর ভিত্তি করে হলেও এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তখন ব্যাপকসংখ্যক গ্রাম-স্কুল চালু ছিল এবং দরিদ্র শ্রেণির পিতামাতার মনেও তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের বাসনা অবশ্যই গভীর ছিল।[৪] মি. এডাম যে সময়ের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বর্ণনা দিয়েছেন, তখন মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগে অবশ্যই তাদের মধ্যে শিক্ষার অবস্থা আরও উন্নত ছিল। মুসলমান শাসনামলে এ ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়, মক্তব ও পাঠশালার সংখ্যা নিশ্চয় আরও বেশি ছিল। সে সময়ে প্রত্যেক মুসলমানেরই তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করার অধিকতর সামর্থ্য ছিল। ফলে সে যুগে প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানই রাজ-সরকারে অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরির আশা করতে পারত।

মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল– এটি অবশ্যই অনস্বীকার্য। মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে এ. জি রলিনসন মন্তব্য করেন–

> মুঘল ভারতের উন্নততর শিক্ষা সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে এই উত্তম শিক্ষাপদ্ধতিরই ফলশ্রুতি। শিক্ষা ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত হতো। শিশু যদি ধনী পিতামাতার পুত্র হতো, তাহলে চার বছর বয়সে তাকে কুরআনের একটি আয়াত খোদাইকৃত পাথর বসানো স্লেট দিয়ে একজন শিক্ষকের হাতে তুলে দেওয়া হতো। শিশু যদি গরিব পিতামাতার সন্তান হতো, তাহলে তাকে মৌলবি পরিচালিত মক্তব কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো হতো। প্রতিটি মসজিদের সঙ্গে একটি মক্তব ছিল।[৫]

ধর্মীয় শিক্ষাদানই ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি। বালক-বালিকা নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান শিশু সন্তানকে ধর্মের মূলনীতিসমূহ ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হতো। কবি বিপ্রদাশ বলেন– 'মুসলমান ছেলেমেয়েদেরকে মক্তবে ওজু করা ও নামাজ পড়া শেখানো

---

৩. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃ. ১২।

৪. W. Adam, *Education Report* (1835-38) Kolkata, page : 6-7

৫. H.G Rawlinson, *India A Short Cultural History* (London-1937), page : 372.

হতো'।[৬] তবে ধর্মীয় বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়াদিও মক্তবে পড়ানো হতো। রলিনসন মন্তব্য করেন–

> এখানে (মক্তবে) সে (শিশু) কালেমা বা ধর্মবিশ্বাস ও কুরআন থেকে কিছু আয়াত মুখস্থ করত, যা তার দৈনন্দিন প্রার্থনায় প্রয়োজন হতো। কুরআন মুখস্থ করার একটি সাধারণ রীতিও প্রচলিত ছিল। এর সঙ্গে রসুলুল্লাহর (সা.) হাদিস, ফারসি ভাষা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হতো। সুচারু লিখন-পদ্ধতির চর্চা করা হতো এবং বালক যদি শিল্পকলার শিক্ষালাভে আগ্রহী হতো, তাহলে তাকে একজন ওস্তাদ বা শিক্ষকের নিকট শিক্ষানবিশের জন্যে প্রেরণ করা হতো।[৭]

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে আরবি, ফারসি ও বাংলা– এই তিনটি ভাষা শিক্ষা নিতে হতো। কুরআন ও হাদিস শিক্ষার জন্য আরবি ভাষা শেখা একান্ত প্রয়োজন ছিল। সমগ্র মুসলমান শাসনামলে ফারসি ছিল রাজদরবারের ভাষা ও শিক্ষার বাহন। সুতরাং রাজ-সরকারে অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি-বাকরির জন্য ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন অত্যাবশ্যক ছিল।

মাধ্যমিক ও উচ্চতর পাঠ্যক্রম

বাংলায় সুলতানি শাসনামলে মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের বিদ্যালয়গুলো 'মাদ্রাসা' নামে আখ্যায়িত ছিল। সে যুগের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র মক্তব থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত শিক্ষার সর্বস্তর ছিল অবৈতনিক। ছাত্রদের ওপর কোনো প্রকার বেতন ধার্য করা হতো না। মুসলিম শাসক ও সম্পদশালী অভিজাত ও জমিদারবর্গ করমুক্ত জমি দান করে মসজিদ, মক্তব, টোল ও মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহ করতেন। পাঠশালার শিক্ষকেরা সামান্য বেতনেই ছাত্রদের নিজগৃহে শিক্ষা দিতেন কিংবা স্থানীয়দের সঙ্গে মিলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন। ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পাঠশালার গুরুই ছিলেন প্রধান বিচারক। ছাত্রের শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেই তিনি ছাত্রকে সনদ প্রদান করতেন। রাষ্ট্র কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা তখন ছিল না। শিক্ষার্থীরা জানত যে, শিক্ষকই তাদের মূল্য যাচাই করার একমাত্র কর্তা। সুতরাং এই শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্য বাছাই করে পড়ার বা ফাঁকি দেওয়ার অবকাশ ছিল না।

বাংলায় অধ্যয়ন বলতে 'পড়াশোনা' শব্দবন্ধের ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বাংলার টোলের শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে 'পড়াশোনা' বললেও বাংলা পাঠশালার শিক্ষাপ্রক্রিয়া থেকেই 'লেখাপড়া' শব্দবন্ধের উদ্ভব বলে মনে হয়। যদিও পরবর্তীকালে পড়াশোনা ও লেখাপড়া সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। পাঠশালার পড়াশোনা শেষ করে যে-কেউ ইচ্ছা করলে টোল বা মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। বহু মসজিদ ও ইমামবাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে, এ সমস্ত মসজিদ ও ইমামবাড়াগুলোর কিছু কিছু মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে এমনকি

৬. *বিপ্রদাশ মনসামঙ্গল*, পৃষ্ঠা : ৬৭
৭. H.G Rawlinson, *India A Short Cultural History* (London-1937), page : 372.

উনিশ শতক পর্যন্তও চালু ছিল।[৮] আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে মুসলমান যুগে ভারতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায়। তিনি মন্তব্য করেন– 'প্রত্যেক সভ্য জাতিরই যুবকদের শিক্ষার জন্য স্কুল রয়েছে, কিন্তু হিন্দুস্তান বিশেষ করে তার বিদ্যালয়গুলোর জন্যে প্রসিদ্ধ।'[৯]

সরকার ও অবস্থাশালী ব্যক্তিরা মাদ্রাসা ও মসজিদগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে উদারভাবে লাখেরাজ জমি দান করতেন। কাজী নাসির উদ্দিন ত্রিবেনীতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ও ছাত্রদের ব্যয়ভার বহন করার জন্যে সুব্যবস্থা করেছিলেন। বাঘার মাদ্রাসার জন্য ৪২টি গ্রাম দান করা হয়েছিল। শিক্ষা ছাড়াও ছাত্ররা বিনা খরচে আহার, বাসস্থান, কাপড়চোপড়, তেল, প্রসাধনী দ্রব্যাদি এবং মূল গ্রন্থ ব্যবহারের প্রয়োজনে পাণ্ডুলিপি নকল করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ পেত। বীরভূমের বিদ্যালয়গুলোর কথা উল্লেখ করে মি. এডাম বলেন–

> এগুলো ধর্মীয় দানের দ্বারা পরিচালিত হতো এবং বিনা খরচে ছাত্রদের শিক্ষা, আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা বৃত্তি লাভ করত। ব্রিটিশ সরকারের লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির বিবরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে মুসলমান শাসনামলে, ধর্মীয় ও শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মপ্রাণ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য অসংখ্য নিষ্কর জমির ব্যবস্থা ছিল।[১০]

> শিশুদের পাঠ্যবই দেখলে মনে হবে তারা মুসলিম না, সবাই মূর্তিপূজারি

মি. এডাম তার রিপোর্টে বর্ণনা দেন, সম্পদশালী মুসলমানগণ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য তাদের গৃহে শিক্ষক রাখতেন এবং বিনা খরচে স্থানীয় গরিব ছেলেমেয়েরা তাদের নিকট শিক্ষালাভ করত। তিনি লিখেছেন–

> পাণ্ডুয়ায় কোনো কোনো প্রসিদ্ধ স্থানে প্রতিবেশী গরিব ছেলেমেয়েদের উপকারার্থে মুসলমান জমিদারগণ নিজেদের খরচে শিক্ষক রাখতেন বলে জানা যায়। একজন ধনী গৃহস্থ বা গ্রাম্যপ্রধান শিক্ষার উদ্দেশ্যে গৃহে শিক্ষকের ব্যবস্থা করেননি, এ রকম দৃষ্টান্ত প্রায় বিরল বলা যায়।[১১]

---

৮. A. R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal,* page : 149

৯. *আইন-ই-আকবরী*, প্রথম খণ্ড, N. N. Law, page : 161.

১০. এম এ রহিম, পৃষ্ঠা : ২২০।

১১. W.Adam, *First Report*, Kolkata, page : 55.

মি. এডাম মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পতন যুগের শিক্ষার অবস্থা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্য ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগে তাদের শিক্ষার অবস্থা আরও উন্নত ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

হিন্দুদের জন্য শ্রেণিহীন উদার শিক্ষাক্রম

মুসলমানদের আগমনের আগে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলিম শাসকরা সুবিধাভোগী হিন্দু শ্রেণির কবল থেকে নিম্নবর্গের হিন্দুদের সুবিধা লাভের সুযোগ করে দেন। ফলে নিম্নবর্গের হিন্দুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। মুসলিম শাসকরা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য যে করমুক্ত ভূমি দান করতেন, তা শুধু মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না; হিন্দুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্যও করমুক্ত তথা লাখেরাজ সম্পত্তি দান করা হতো। নিষ্কর জমি সরকার থেকে দান করা হতো মাদ্রাসা ও টোলের জন্য, প্রাথমিক শিক্ষা বা পাঠশালার জন্য নয়। পাঠশালা শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ স্বনির্ভর।

মুসলিম শাসকরা পাঠশালা শিক্ষার জন্য কোনো নিষ্কর ভূমি বরাদ্দ না করলেও নিম্নবর্গের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সেটা কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। হিন্দু কবির রচিত 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে জানা যায়– মুসলিম শাসনামলে হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণির 'হাড়ি' ও 'সহুরাগণ' (সাহা) দলিলপত্র পড়া ও লেখার মতো যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন।[১২] এমনকি নাপিত ও ঝাড়ুদাররা বিদ্যা ও সাহিত্যজ্ঞানে খ্যাতি অর্জন করেন। নল-দময়ন্তীর কবি মধুসূদন ছিলেন একজন নাপিত। জনৈক গোয়ালা রাম নারায়ণ গোপ *দৈবায়ন উপাখ্যান* রচনা করেন এবং একজন ধোপা ভাগমন্তভূতি *হরিবংশ* লিখে সম্মান অর্জন করেন।[১৩]

হিন্দু বালক-বালিকাদেরকে পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা দান করা হতো এবং এসব পাঠশালা সাধারণত ধনী ব্যক্তিদের গৃহ-সংলগ্ন ছিল কিংবা গুরুগৃহের কোনো বৃক্ষতলে অবস্থিত ছিল। গুরু একখানা টুলে আসন গ্রহণ করতেন এবং বালক-বালিকারা তাদের নিজেদের মাদুরে বসত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মক্তব ও পাঠশালা একই চালার নিচে একত্রে বসত। মুন্‌শী (মুসলমান শিক্ষক) ভোরে শিক্ষাদান করতেন এবং পণ্ডিত (হিন্দু গুরু) বিকালে ছাত্রদের শিক্ষাদান করতেন।[১৪] ধনী হিন্দুরা পাঠশালার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। *মনসামঙ্গল* কাব্যের কবি বিজয়গুপ্ত বলেন, চাঁদ সওদাগর একটি বৃহৎ পাঠশালার ব্যয়ভার বহন করতেন এবং সেখানে সোমাই পণ্ডিত নামক গুরুর নিকট তার ছয় পুত্র শিক্ষা গ্রহণ করে।[১৫]

সর্বোপরি, মুসলমান আমলে শিক্ষা ও জ্ঞান নানাভাবে বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনকে উন্নত করে তোলে। ফলে দেশে এক অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক

১২. *মানিকচন্দ্র রাজার গান*, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ৭২।
১৩. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, পৃষ্ঠা : ২৭৪-২৭৫।
১৪. *বিক্রমপুরের ইতিহাস*, পৃষ্ঠা : ৩৩০-৩৩৩।
১৫. বিজয় গুপ্ত, *মনসামঙ্গল*, পৃষ্ঠা : ৯৫।

জাগরণ দেখা দেয়। বাঙালি সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার ঘটে। জ্ঞানালোকে দীপ্ত মুসলিম শাসন ও শাসকদের উদার শিক্ষানীতির প্রভাবে যুগ-যুগব্যাপী বন্দিদশা থেকে নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তি সম্ভব হয়। এ ছাড়াও মুসলমানগণ বহু নতুন নতুন শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যার ফলে বাংলাদেশে শিক্ষার দ্রুত উন্নতি ও শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম হয়। তারাই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস প্রবর্তন করেন এবং লেখ্যবস্তুরূপে কাগজের প্রচলন করেন। পুস্তক নকল করে প্রচারের রীতি প্রবর্তন করার জন্য বাংলাদেশ মুসলমানদের নিকট ঋণী। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মুসলমানদের অবদানের প্রশংসা করে যদুনাথ সরকার বলেন–

> যখন প্রথম যুগের হিন্দু লেখকগণ সাধারণ রীতি অনুসারে তাদের রচিত পুস্তকাদি গোপন রাখতে ভালোবাসতেন, সেই যুগে পুস্তক নকল করার এবং তা প্রচারের দ্বারা জ্ঞান বিস্তারের প্রথা প্রচলনের জন্য আমরা মুসলমানদের নিকট ঋণী।[১৬]

ঔপনিবেশিক শিক্ষাক্রম ও মুসলিম আত্মপরিচয়ের সংকট

ব্রিটিশরা প্রথমে শাসকের মসনদে এসেই মুসলমানদেরকে সমূলে উৎপাটনের কাজে সর্বশক্তি, ক্ষমতা-বুদ্ধি ও কলাকৌশল কঠোর এবং অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে নিয়োজিত করে। কিন্তু শুরুতেই তারা মুসলিম শিক্ষাক্রমের ওপর আঘাত করেনি। প্রচলিত ফারসি ভাষাকেই দ্বিতীয় রাজভাষার আসনে দীর্ঘকাল বসিয়ে রাখা হয়। ফারসির বদলে ইংরেজি চালু করার ঝুঁকি নিতে তারা রাজি হয়নি। নতুন ভাষা চালু করতে খরচের সমস্যা তো ছিলই, তার ওপর আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের দগদগে ক্ষত ইংরেজদের তখনও শুকায়নি। তাদের যুক্তি– ভারতের নেটিভদের ইংরেজি শিখিয়ে 'চোখ খোলার' দরকার নেই, যেমন ব্যবস্থা আছে তেমনি চলুক। অতএব, ফারসির বিদ্যমান মর্যাদা কোম্পানির শাসনের প্রথম পর্বে শুধু অক্ষুণ্নই ছিল না, ভাষাটি কিছু আশ্রয় এবং প্রশ্রয়ও পেয়েছিল। কলকাতা মাদ্রাসা ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের ফারসি শেখানো হতো। দেশীয় ভাষা সংস্কৃত, আরবি-ফারসি উন্নতির জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দও এর বড় প্রমাণ।[১৭]

দেশজুড়ে প্রচলিত ফারসি ভাষার পঠন-পাঠন মোটামুটি ১৮৩২ পর্যন্ত বহাল রইল। সে সময় ফারসি না শিখলে বাঙালি হিন্দুর কোম্পানির কাছারিতে, ব্যবসায়ীর আড়তে অথবা দেশীয় জমিদারের সেরেস্তায় কাজ জুটত না। মুসলমানরা বহু আগে থেকেই একটু একটু করে অফিসচ্যুত হতে থাকে। সুতরাং, বাঙালি হিন্দু অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের আগের মতোই কিছু সময় পর্যন্ত ফারসি শিখিয়ে যান। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের শাসনতান্ত্রিক ভিত যখন শক্তিমত্তার দিক থেকে সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করে এবং মুসলমানদের সাথে

---

১৬. J.N. Sarkar, *India Through the Ages*, page : 52.

১৭. মাহবুব আলম, *দেখা না দেখায় মেশা ইতিহাসের বিচিত্র কাহিনি*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, পৃষ্ঠা : ৪৪।

দীর্ঘকাল সংঘর্ষের পরও যখন তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় না, ঠিক তখনই তারা মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে বিশেষ মনোযোগী হয়। উইলিয়াম হান্টারের ভাষায় বললে, ব্রিটিশরা সেকালে মুসলমানদেরকে সন্দেহের চোখে দেখত। তারা মনে করত, যেহেতু তখন পর্যন্ত মুসলমানরাই ছিল ভারতের প্রকৃত শাসক, কাজেই তাদেরকে ব্রিটিশদের বশ্যতা স্বীকার করাতেই হবে। হান্টার অন্যত্র লিখেছেন– 'এদেশ আমাদের অধিকারে আসার আগে তারা (মুসলমান) শুধু যে রাজনৈতিক নিয়ন্তা ছিল তা-ই নয়, চিন্তার ক্ষেত্রেও ছিল তারা প্রধান শক্তি। তাদের শিক্ষাব্যবস্থা মোটেই উপেক্ষণীয় ছিল না এবং এ ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা চিন্তা এবং বৈষয়িক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল।' মুসলমানদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব খর্ব এবং নির্মূল করার উদ্দেশ্যে হান্টার লেখেন–

> ইতিমধ্যে আমরা আমাদের নিজস্ব এক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছি এবং যেইমাত্র এই নতুন ব্যবস্থায় যথেষ্ট নতুন লোক শিক্ষিত হয়েছে, তখনই আমরা পুরোনো মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছি, আর মুসলমান যুবকদের সামনে কর্মসংস্থানের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে।[১৮]

ম্যাকলের ভাষায় ব্রিটিশদের এই শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল–

> We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect. To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from the Western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population.[19]

ম্যাকলের উপরোল্লিখিত উক্তি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, কলোনিয়াল শক্তিগুলো তাদের উপনিবেশগুলোতে আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিপরীতে নিজেদের পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রাধান্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই নয়া জ্ঞানকাণ্ড প্রজেক্ট তথা শিক্ষাব্যবস্থা হাজির করে, যা পুরোনো জ্ঞানগত প্যারাডাইম ও শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন করে। তারা নতুন এই শিক্ষাব্যবস্থার 'সুফল' মূলত উপনিবেশকৃত অঞ্চলের আঞ্চলিক অভিজাত শ্রেণির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, যারা শুধু কলোনিয়াল শাসনের প্রশাসনিক যন্ত্রের কর্মচারীর চাহিদাই পূরণ করবে না; বরং বহিরাগত কলোনিয়াল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়দের মধ্যে দোভাষী হিসেবে কাজ করবে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের কলোনি ছেড়ে যাওয়ার সময় কলোনিয়াল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত এই অভিজাত শ্রেণির কাছেই ক্ষমতা অর্পণ করে যায়। কলোনিয়াল শাসন থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর শাসকগোষ্ঠী মোটাদাগে কলোনিয়াল কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রচলিত প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও অভিজাত সাংস্কৃতিক কাঠামোই বজায় রাখে; যা মূলত

১৮. *The Indian Mussalmans.*
১৯. T.B. Macaulay, *Minute on Education*, page : 08.

নিও-কলোনিয়ালিজম নামে একটি নতুন ফেনোমেনার জন্ম দেয়। মোটকথা, তদানীন্তন ব্রিটিশ আমলে মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রাখার জন্য ব্রিটিশ এবং হিন্দুরা একযোগে মুসলিম আমলের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করে যে, সেই অভিশাপ থেকে আজও বাংলাদেশের মুসলমানরা পূর্ণ মুক্তি পায়নি। ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাক্রমে মুসলমানদের হৃদয়ের তিনটি প্রগাঢ় অনুভূতিকে উপেক্ষা করা হয় :

১. ফারসি ও আরবি ভাষার পরিবর্তে তদানীন্তন বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ ও এ কাজে হিন্দু শিক্ষক নিয়োগ।
২. মুসলমানদের জীবনের মর্যাদা ও স্বীয় ধর্মের অনুশীলনসমৃদ্ধ ভাষা এবং বিষয়বস্তু বঞ্চিত পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি প্রবর্তন।
৩. মুসলমান যুবকদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা উপেক্ষা করা।

এর ফলে ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষা মুসলমানদের নিকট শুধু অগ্রহণযোগ্য ও বর্জনীয়ই হয়ে ওঠেনি; বরং তা তাদের জাতীয় সত্তা ও মুসলমানি স্বীকৃতির কবর রচনার বিকটরূপও পরিগ্রহ করে।

কলোনিয়াল শাসন-পূর্ব ইসলামি বিশ্বের মাদ্রাসাগুলোতে বিভিন্ন পঠিত বিষয়কে উলুম আল মা'কুল (যুক্তিসংক্রান্ত জ্ঞান) এবং উলুম আল মানকুল (রেওয়ায়েতকৃত জ্ঞান)-এ বিভক্ত করা হতো।[২০] উলুম আল মানকুলে কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ, উসুলুল ফিকহসহ এমন সব বিষয় পড়ানোর হতো, যা আজকের যুগে ধর্মীয় বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত। চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুসলিম আলেম, সমাজতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন তাঁর সময়ে মুসলিম বিশ্বের মাদ্রাসাগুলোতে উলুম আল মা'কুলের আওতায় লজিক, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যামিতি, পাটিগণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, বীজগণিত, আলোকবিদ্যাসহ (Optics) অন্যান্য বিষয়াদি পড়ানো হতো বলে উল্লেখ করেছেন, যেসব বিষয়কে আজকের যুগে সেক্যুলার বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিশুদের শিক্ষায় কুরআন কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করত।[২১]

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শিক্ষাপ্রকল্প

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট নতুন দেশ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষাক্ষেত্রে স্বকীয় আদর্শ ও স্বকীয়তা অর্জনের লক্ষ্যে তদানীন্তন পূর্ব বাংলা সরকার East Bengal Educational Ordinance, 1947 জারি করে। এ অর্ডিন্যান্স বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাগপাশ হতে মুক্তি পেয়ে পূর্ববঙ্গের সকল প্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ অনুমোদন, সংযুক্তিকরণ এবং নির্দেশদানের ক্ষমতা অর্জন করে।

---

২০. Francis Robinson, 'Ottomans-Safavids-Mughals: Shared Knowledge and Connective Systems', *Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (1997), page :152.

২১. Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, trans. Franz Rosenthal (Princeton: Princeton. University Press, 2005), 370-390, 422-424.

সাধারণ ও প্রকৌশলী ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, প্রবেশিকা প্রদানকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ উচ্চ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত অর্ডিন্যান্সের ফলে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আওতাধীন হয়। তা ছাড়া এ অর্ডিন্যান্সের কারণে 'বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন ঢাকা' নামক প্রতিষ্ঠানটিকে অবলুপ্ত করে তার স্থলে 'ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড' স্থাপন করা হয়। অনুরূপভাবে ঢাকা মাদ্রাসাকে 'মাদ্রাসা-ই-আলিয়া' নামে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে কলকাতা মাদ্রাসা হতে পূর্ব বঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষাকে পৃথক করে ফেলা হয়।

অধিকন্তু মাওলানা আবুল কালাম আজাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মাদ্রাসা-ই আলিয়ায় কলকাতা মাদ্রাসার আরবি বিভাগটিও খোলা হয়। এ সময়েই 'মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড' নামে একটি দপ্তর স্থাপনের মাধ্যমে আলিম, ফাজিল এবং কামিল পরীক্ষাসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার জেনারেল মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড হতে পৃথক করা হয়। তা ছাড়া মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর সভাপতিত্বে (১৯৪৫-৫১) পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলের শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে 'ইস্ট বেঙ্গল এডুকেশনাল সিস্টেম রি-কন্সট্রাকশন' কমিটি পূর্ব বঙ্গের সরকারকে কতিপয় প্রস্তাব পেশ করে। তন্মধ্যে নতুন ও পুরাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত মাদ্রাসা শিক্ষাকে একীভূত করে একটিমাত্র শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার সুপারিশ ছিল অন্যতম। উক্ত কমিটি আধুনিক শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় সংস্কারসহ গোটা দেশে একই রকম শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার জন্য 'ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক লার্নিং' প্রতিষ্ঠার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কমিটির কোনো সুপারিশই তদানীন্তন সরকার কার্যকর করেনি।[২২]

পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৯৫৭ সালের

> ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের ইসলামি চরিত্র উন্মেষের কোনো 'রূপরেখা ও শিক্ষানীতি' এই কমিশনে ছিল না অথবা দেওয়া হয়নি। এমন শিক্ষানীতির পরিণামে পাকিস্তান, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান সেই আমলেই সেক্যুলার শিক্ষার পথে অগ্রসর হওয়ার সমর্থন পায় ইসলামবিরোধীদের সম্মতি ও পৃষ্ঠপোষকতায়। এই শিক্ষানীতির ভয়াবহ পরিণাম আঁচ করেই ইসলামি শিক্ষা সমর্থনকারী নির্ভীক ও নিবেদিত নেতা, বিজ্ঞান বিভাগের আদর্শনিষ্ঠ ও মেধাবী ছাত্র আব্দুল মালেককে নৃশংসভাবে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল

২২. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর, *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি*, বুক পয়েন্ট-ঢাকা, পৃষ্ঠা : ২৪৫-২৪৬।

শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের পর সেখানে কমিশন সরকারের নিকট বেশ কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরে। উল্লেখ্য, একমাত্র মাদ্রাসা পদ্ধতির সংশোধন ব্যতীত তখন অন্য কোনো সুপারিশ আর বাস্তবায়ন হয়নি। পরের বছরই পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা সচিব এস এম শরীফের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। শরীফ কমিশনের সুপারিশসমূহের বেশ কয়েকটি মোটামুটি কার্যকর হতে দেখা যায়, যা অন্যান্য কমিশনের বেলায় ঘটেনি। তা ছাড়া এ কমিশন আর যা-ই হোক, শিক্ষাকে ইসলামিকরণে অন্যান্য কমিশনের চেয়ে যথেষ্ট সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভূমিকার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিল।

১৯৬৯ সালে গৃহীত নূর খানের শিক্ষানীতিতে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে যুগপৎ গণতন্ত্রমুখী ও বিভিন্ন ধারার প্রয়োজনীয়তার প্রতি পুনর্বার গুরুত্ব প্রদানসহ বিজ্ঞান ও প্রকৌশলগত শিক্ষায় উৎকর্ষ সাধনের উল্লেখ করা হয়। এ শিক্ষানীতি বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের ভারসাম্য সৃষ্টি করতে ৫০:৫০ অনুপাত সৃষ্টি ও সংরক্ষণের জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। 'নূর খান কমিশন'-এ তথাকথিত বস্তুবাদী সমৃদ্ধির চমৎকার নিদর্শনও ছিল বটে; তবে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের ইসলামি চরিত্র উন্মেষের কোনো 'রূপরেখা ও শিক্ষানীতি' এই কমিশনে ছিল না অথবা দেওয়া হয়নি। এমন শিক্ষানীতির পরিণামে পাকিস্তান, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান সেই আমলেই সেক্যুলার শিক্ষার পথে অগ্রসর হওয়ার সমর্থন পায় ইসলামবিরোধীদের সম্মতি ও পৃষ্ঠপোষকতায়। এই শিক্ষানীতির ভয়াবহ পরিণাম আঁচ করেই ইসলামি শিক্ষা সমর্থনকারী নির্ভীক ও নিবেদিত নেতা, বিজ্ঞান বিভাগের আদর্শনিষ্ঠ ও মেধাবী ছাত্র আব্দুল মালেককে নৃশংসভাবে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল।[২৩]

এই শিক্ষানীতি অবশ্য পুরোদস্তুর বাস্তবায়নের সময় পায়নি। কারণ, বাংলাদেশ খুব দ্রুত ১৯৭১ সাল তথা নতুন স্বাধীন ভূখণ্ডের দিকে যাত্রা করে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের প্রাক্কালে দেশের শাসকবৃন্দ চাইলে শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নতির পথে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারতেন। পাকিস্তান একটি ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবেই পরিচিত ছিল। তদুপরি এর নেতৃবৃন্দ ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ফলে এই রাষ্ট্রের ভেতর থেকে আরেকটি নয়া রাষ্ট্রের উত্থান ঘটলেও তা মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ী না হয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে একধরনের হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতির আবহ নিয়ে খাড়া হয়ে যায়। কমিউনিস্ট রাজনীতির দীর্ঘ দোলাচলে বাঙালি মুসলমান হারায় তার মুসলিম তমুদ্দুনিক ও স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়।

বাংলাদেশ আমলের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপ্রকল্প

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতিকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তৎকালীন সরকার ১৯৭২ সালের এক আদেশে ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন' নামে একটি কমিশন গঠন করে। কমিশনের সদস্যগণ ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক

২৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৪৫-২৪৬।

আমন্ত্রিত হয়ে ভারত সফর করেন। এক মাসব্যাপী এ সফরে কমিশনের সদস্যগণ সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯৭৪ সালে কমিশন সরকারের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন দীর্ঘ সময় ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার মাধ্যমে তাদের রিপোর্ট প্রস্তুত করে। কিন্তু রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই এটি বিতর্কিত হয়ে পড়ে। কমিশনের সুপারিশমালায় এমন কিছু মৌলিক দিক ও বিষয় ছিল, যা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীত এবং জনগণের চিন্তা-চেতনা, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক জীবনবোধের পরিপন্থি।

প্রকৃতপক্ষে কুদরত-ই-খুদা কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য ছিল একটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন। অর্থাৎ, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির উপযোগী ধর্মবোধ বিবর্জিত একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন। আরেকটু খোলাসা করে লিখলে, এর উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে–

> এ উদ্দেশ্যে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যাতে এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।...
>
> বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।[২৪]

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে,

- এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক যে মুসলমান,

> বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৭২-এর সংবিধান রচনার সময়ে মৌলিক গঠনতন্ত্র হিসেবে সেক্যুলারিজম ও সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তি জনগণের রায় অনুযায়ী ছিল না; বরং তা ছিল শাসকগোষ্ঠী দ্বারা আরোপিত। নতুন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে কোনো নির্বাচনের ভিত্তিতে এ সংবিধান রচনাকারী সরকার গঠিত হয়নি; বরং ১৯৭০-এর নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের ভিত্তিতেই নব প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হয়। ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টোর অন্যতম মূল পয়েন্ট ছিল ছয় দফার বাস্তবায়ন আর ছয় দফার প্রথম ভিত্তিই ছিল লাহোর রেজ্যুলেশনের ভিত্তিতে পাকিস্তানে ফেডারেশন সরকারব্যবস্থা গঠন করা।

২৪. এ. কে. এম আজহারুল ইসলাম, শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, আহসান পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা : ০৫।

তা গোটা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের কোনো পাতাতে যথার্থরূপে তো দূরে থাকুক, সামান্যভাবেও ফুটে ওঠেনি।

- ১৯৭১ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া ও পরীক্ষাদানে ছাত্রসমাজের যে চিত্র ফুটে ওঠে, তা নকলবাজি ও এতৎসংক্রান্ত দুর্নীতির মহোৎসবরূপে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পায়। এর কোনো প্রকার মূল্যায়ন করা হয়নি।
- ছাত্র-শিক্ষক যে 'মধুর সম্পর্ক' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাঠ-ঘাটে প্রতিভাত হয়; তা রীতিমতো শিক্ষকতা পেশার মর্যাদা পদানত হওয়ার মতো। অথচ এর প্রতিকার বিধানমূলক বক্তব্য রিপোর্টে আসেনি।
- সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শিল্পকলা চর্চা এবং উৎকর্ষের নামে অশ্লীল রুচি ও অঙ্গভঙ্গির প্রদর্শনী অবলোকন করার পর আদর্শ শিক্ষক-অভিভাবক সমাজ যে অস্থির এবং উদ্বিগ্ন ছিল; সে বিষয়টি নিয়েও শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে কোনো উল্লেখ না থাকায় সুধী মহল চরমভাবে নিরাশ হয়।

স্মরণ রাখা দরকার যে, ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গঠিত মুজিবনগর সরকারের মেনিফেস্টোর কোথাও নতুন প্রতিষ্ঠিত দেশের মৌলিক গঠনতান্ত্রিক নীতি হিসেবে 'সেক্যুলারিজম ও সমাজতন্ত্র' উল্লেখ করা হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৭২-এর সংবিধান রচনার সময়ে মৌলিক গঠনতন্ত্র হিসেবে সেক্যুলারিজম ও সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তি জনগণের রায় অনুযায়ী ছিল না; বরং তা ছিল শাসকগোষ্ঠী দ্বারা আরোপিত। নতুন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে কোনো নির্বাচনের ভিত্তিতে এ সংবিধান রচনাকারী সরকার গঠিত হয়নি; বরং ১৯৭০-এর নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের ভিত্তিতেই নব প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হয়। ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টোর অন্যতম মূল পয়েন্ট ছিল ছয় দফার বাস্তবায়ন আর ছয় দফার প্রথম ভিত্তিই ছিল লাহোর রেজ্যুলেশনের ভিত্তিতে পাকিস্তানে ফেডারেশন সরকারব্যবস্থা গঠন করা।

মনে রাখতে হবে, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রস্তাবিত লাহোর রেজ্যুলেশনে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে এবং পূর্বে অবস্থিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল, সেক্যুলার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। সেক্যুলার রাষ্ট্রগঠন কংগ্রেসের প্রজেক্ট ছিল। এ ছাড়াও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টোর আরেকটি পয়েন্ট ছিল কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে কোনো আইন রচনা না করা। ফলে ১৯৭৩-এর ৮ জুন প্রকাশিত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য দেখানো হয়, তা ছিল সম্পূর্ণ 'চাপিয়ে দেওয়া' ও দেশ মাতৃকার জনসাধারণের সাথে 'বিশাল প্রতারণা'। পরে ১৯৭৬ সালে অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ৪৫ সদস্যের সমন্বয়ে নতুন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন করা হয়। এই কমিটি ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য ভাষা, সাহিত্য ও পরিবেশ-পরিচিতি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করে এবং প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পাঠ্যভুক্ত করে। বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে পাঠ্যসূচিতে স্থান দেওয়া হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষায় সাধারণ ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২৫]

১৯৭৮ সালে তৎকালীন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আব্দুল বাতেন ও পরে শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদকে সভাপতি করে 'শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ' নামে দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক প্রতিনিধি ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে ৪০ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। পরিপূর্ণ শিক্ষানীতি প্রণয়ন সময়সাপেক্ষ বিবেচনায় পরিষদ অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি তৈরি করে। এতে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বেতনকাঠামো তৈরি ও শিক্ষকদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পদক ও পুরস্কার প্রদানের সুপারিশ করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও উৎপাদনমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়।

১৯৮৩ সালে শিক্ষামন্ত্রী ড. আবদুল মজিদ খানের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটি গঠিত হয়। 'মজিদ খান কমিটি' শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থাপনার ওপর তাদের রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার গলদ তুলে ধরা হয় এবং শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য বেশ কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব রাখা হয়। এতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত আরবি ও ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৯৮৭ সালে অধ্যাপক মফিজ উদ্দীন আহমদকে চেয়ারম্যান করে ২৭ সদস্যবিশিষ্ট 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন-১১' গঠন করা হয়। কমিশনের দুটি কমিটি জাপান, চীন ও থাইল্যান্ড সফর করে সেসব দেশের শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে। কমিশন ১৯৮৮ সালে তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে দেশের শিক্ষা সংস্কার, পুনর্বিন্যাস এবং উন্নয়নের অনেকগুলো দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। কমিটি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনর্নির্ধারণ করে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও সংকট চিহ্নিত করে। রিপোর্টে অবৈতনিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ করা হয়। কমিশনের রিপোর্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ধারা সংযুক্ত হয়, তা হলো– 'শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মানুরাগ বৃদ্ধি করা, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসমূহের বিকাশ সাধন করা'।[২৬]

১৯৯৪ সালে শিক্ষা কারিকুলামকে ঢেলে সাজাবার জন্যে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্সের আওতায় নতুনভাবে যে কারিকুলাম তৈরি করা হয়, তাকে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হতে পারে। এতে শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে বলা হয়— 'শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হলো শিক্ষার মূল লক্ষ্য'। ১৯৯৭ সালে নতুন সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজে হাত দেয়। প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হকের নেতৃত্বে সরকার ৫৬ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। ১৯৭৪ সালে প্রণীত 'কুদরত-ই-খুদা কমিশন' রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তখন পূর্বশর্ত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। সরকারের নির্দেশে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সাথে সাথে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। নতুন করে

২৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ০৯।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১০।

শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সবাই স্বীকার করলেও বিতর্কিত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার কারণে প্রতিবাদ তীব্র আকার ধারণ করে। দেশের শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, আলেম-ওলামা, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-শিক্ষক, সংগঠন-সংস্থা ও রাজনৈতিক দলগুলো এর প্রতিবাদ করে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও সংস্থা নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা এবং বিবৃতির মাধ্যমে সরকারি নীতির সমালোচনা করা হয় এবং জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবি পেশ করা হয়।

শিক্ষা খাতে অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার প্রস্তাব করতে ২০০১ সালে ড. এম আব্দুল বারীর নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ২০০২ সালে তার প্রতিবেদন জমা দেয় এবং বেশ কয়েকটি বিষয়ে হস্তক্ষেপের পরামর্শ দেয়, যা পরে ২০০৩ সালের শিক্ষা কমিশন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়ার নেতৃত্বে বিবেচিত হয়। রিপোর্টটি ৩০টি মৌলনীতি ভিত্তি করে বিনির্মিত। প্রথম নীতিতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়— 'সমগ্র জনগোষ্ঠীকে স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পদে পরিণত করা।' এই সম্পদ এর ব্যাখ্যা অপরিহার্য। কারণ জাতি হিসেবে বাংলাদেশি জনসম্পদের স্বকীয় প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ শিক্ষানীতিতে সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে ব্যক্ত না থাকলে 'থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়'-এর মতো এদেশের প্রজন্ম প্রতিনিয়ত ভিনদেশি জাতীয়তাবাদ ও আদর্শিক প্রশ্নে দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খাবে এবং ভিনদেশি ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় নিপতিত হবে।

দশম নীতিতে একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়। এই ক্ষেত্রেও পূর্বের মতো 'একমুখী'-এর স্বরূপ ও স্বচ্ছতা অবগুণ্ঠিত রয়। ঠিক তেমনিভাবে 'নৈতিক শিক্ষা' ও জাতীয় আদর্শ' তথা 'ইসলামভিত্তিক' শিক্ষাদানের উল্লেখ না থাকায় দেশজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বাস্তবতার আলোকে মৌলিক নীতিমালা প্রণয়নের কোনো দিকনির্দেশনা দিতে দারুণভাবে অপারগ হয় এই কমিশন। মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন ও এর মাধ্যমে প্রত্যেক জাতির নৈতিক সত্তাভিত্তিক সামগ্রিক বিকাশ সাধনের হাতিয়ারই হচ্ছে শিক্ষানীতি। সুতরাং, এই দৃষ্টিতে 'মৌলিক নীতিসমূহ'-এর ওপর পুনর্বিবেচনা করে সুপারিশমালার প্রয়োজনীয় সংস্কার-সংশোধন ও বাস্তবায়নে ত্বরিত পদক্ষেপ একান্তভাবে কাম্য ছিল। পরবর্তীতে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০০' হালনাগাদ করার জন্য সরকার ২০০৯ সালে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি ১৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে। কমিটি কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্টের ১৯৭৪ এবং শামসুল হক শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৯৭ জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। ২০০৯-এর খসড়াটি আনুষ্ঠানিকভাবে ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯-এ সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়। কমিশনের সুপারিশগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে : স্নাতক শিক্ষার স্তরগুলি তিন থেকে দুই এ সংশোধন করা, শিক্ষার সমস্ত ধারার অধীনে কিছু বাধ্যতামূলক বিষয়াবলির বাধ্যতামূলক অন্তর্ভুক্তি, শিক্ষাকে আরও প্রয়োগভিত্তিক করে তোলা এবং একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করা।

সর্বশেষ, ২০২০ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী আমরা যদি এর একমাত্র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে

চাই, তাহলে খেয়াল করব— এযাবৎকাল পর্যন্ত যারাই শিক্ষানীতির সাথে জড়িত ছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল কমিউনিস্ট ঘরানার মানুষ। এরা কেউই সেই কুদরত-ই-খুদার সমাজতান্ত্রিক মনন তৈরির ভাবধারাকে অতিক্রম করে সামনে এগোতে পারেনি। কেউই এই দেশ ও জাতির কথা বিবেচনা করেনি। এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যে দীর্ঘকাল ধরে একটি ধর্মের অধীনস্থ হয়ে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি নিয়ে বসবাস করে আসছে, তার চিন্তাচেতনার বিষয়ে খেয়াল রাখেনি। সর্বশেষ পাঠ্যক্রমও সেই ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু ছিল না। বরং পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় এটি এদেশীয় মুসলিম জনসাধারণের নিজস্ব ইতিহাস, তাহজিব ও তমুদ্দুনকে অস্বীকার করে মুসলিম আইডেন্টিটির ওপর নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করেছে।

স্মরণ রাখা দরকার, উলুম আল মানকুল ও উলুম আল মা'কুলের শ্রেণিবিভাগ মোটেও এ যুগের ধর্মীয় ও সেক্যুলার জ্ঞানের দ্বি-বিভক্তিকরণের মতো নয়। উলুম আল মা'কুলকেও ইসলামের প্যারাডাইমের ভেতর থেকেই চর্চা করা হতো এবং সেগুলোকে ধর্মীয় জ্ঞানের শাখা-প্রশাখাই বিবেচনা করা হতো। কুরআন যদি আল্লাহর লিখিত আয়াত বা নিদর্শন হয়, তবে প্রকৃতিও আল্লাহর অলিখিত আয়াত বা নিদর্শন– এভাবেই জ্ঞানকাণ্ডকে বিবেচনা করা হতো সেসময়। মুসলিম বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানকে আল্লাহর একত্ব ও মহিমার গভীরতা অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে চর্চা করতেন। বিজ্ঞান কোনো গন্তব্যহীন চর্চা ছিল না; বরং তা মহাবিশ্বের অন্তর্নিহিত ও ঐশী তাৎপর্যকে সত্যায়ন করত। এই প্যারাডাইমের ভিত্তিতেই মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করে। আঠারো ও উনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক আগ্রাসন মুসলিম জ্ঞানতত্ত্বের সিলসিলায় হাজির থাকা সেই পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রমের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। মুসলমানরা আইডেন্টিটি পলিটিক্সের ভেতর দিয়ে নিজেদের আত্মপরিচয় ভুলে যাওয়ার উপক্রম হয়। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘকালের সিলসিলায় চলে আসা মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী পরিকাঠামো বাধাগ্রস্ত হয় এবং সংকুচিত রূপ পরিগ্রহ করে।

ম্যাকলে জানতেন, উপনিবেশ চিরস্থায়ী হবে না। কিন্তু উপনিবেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থা উপনিবেশিত হয়ে গেলে তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী— এটা তিনি ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন। ম্যাকলে যে দেশি সাহেব তৈরির কারখানা বানিয়ে গেলেন, তা-ই হয়ে ওঠে ইংরেজের অগ্রবাহিনী। তখন থেকে আর সাম্রাজ্যবাদকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে দেশ দখলের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার দরকার থাকল না। এই অগ্রবাহিনীই সাম্রাজ্যবাদের হয়ে কাজটা এগিয়ে নিল। লক্ষ করুন তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, ইরানের রেজা শাহ পাহলবি কিংবা হামিদ কারজাইদের মতো রাষ্ট্রনায়কদের। কেউ তো বলতে পারবেন না তারা তুর্কি, ইরানি কিংবা আফগানি নন! কিন্তু কাজটা তারা দেশের জন্য করেননি, করেছেন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ হয়ে। ম্যাকলে ঠিক এ রকমটাই চেয়েছিলেন। উপনিবেশের স্থায়িত্ব তিনি চেয়েছিলেন অবশ্যই, কিন্তু উপনিবেশের ভেতরেই যে আরও একটি উপনিবেশের কথা তিনি ভেবে রেখেছিলেন, তার স্বরূপ আমরা কখনোই উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করিনি। এ কারণে উপনিবেশপরবর্তী পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর দিকে তাকালেও আমরা বাস্তবিক ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তার সাথে সাযুজ্য শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা দেখতে পাই না। উল্টো ১৯৬৯ সালের ১৫ আগস্ট আমরা দেখি— নিজ জাতিসত্তা ও মুসলিম আদর্শের চেতনায় প্রস্তাবনা পেশ করার কারণে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আব্দুল মালেককে শহীদ হতে হয়। ম্যাকলের ভূত ও ঔপনিবেশিক মানসিকতা যে আমাদের প্রতিনিয়ত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার কোনো প্রতিকার যেন নেই।

নতুন শিক্ষাক্রম : পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা

জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ গত বছর, অর্থাৎ ২০২২ সালে দেশের ৬২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাইলটিংয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০২৩ শিক্ষাবছরে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণি ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। ২০২৩-এর নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছিল। কিন্তু সেই পরিবর্তন যে বাংলার মাটি ও মানুষকে তার ইতিহাস-ঐতিহ্যের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করার কায়দায় ঠেকবে, সেটা ছিল অনেকটা অপ্রত্যাশিত। অবশ্য শুরু থেকেই নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা ও জনসাধারণের মতামত গ্রহণ না করার অভিযোগ ওঠে; পাশাপাশি অসম্পূর্ণ/খণ্ডিত শিক্ষাক্রম, শিক্ষাক্রম প্রণয়নে সামাজিক ভিত্তিকে বিবেচনায় না রাখা এবং শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না দিয়ে শিক্ষাক্রম-২০২১ বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনাহীন প্রকল্পের অভিযোগও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নতুন শিক্ষাক্রম ২০২৩-এর পাঠ্যবইয়ে ভয়ংকরভাবে দেশের আগামী প্রজন্মকে অদক্ষ, আত্মপরিচয়হীন এবং ইসলামোফোবিক সেক্যুলারাইজড জেনারেশন হিসেবে তৈরি করার গোপন প্রকল্প স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মোটাদাগে পাঠ্যবই পর্যালোচনায় ভয়ানক কিছু সংকট তৈরি করা হয়েছে। সেগুলো একটি একটি করে উল্লেখ করা হলো :

প্রথম শ্রেণির বই-পুস্তক : প্রথম শ্রেণির শারীরিক শিক্ষায় নৃত্য শেখানো হবে।[২৭] পৃথিবীর ১০২টি দেশের কারিকুলাম ঘেঁটে এই শিক্ষাক্রম করা হয়েছে; এর মধ্যে এমন কোনো দেশ কি আছে, যেখানে প্রথম শ্রেণির শিশুদের নৃত্য শেখানো হয়? ২০২৩ সালে প্রথম শ্রেণির জন্য সঙ্গীতের বই ছাপানো হয়েছে।[২৮] এখানে প্রথম শ্রেণির শিশুদের সঙ্গীতের দাদরা, কাহারবা, একতাল, ত্রিতাল, তেওড়া, ঝাঁপতাল, রূপক, ঝম্প সঞ্চারী, আভোগ ইত্যাদি শিখতে হবে। ব্রিটেনের মতো উন্নত দেশগুলোতেও মিউজিক ক্লাস শুরু হয় তৃতীয় শ্রেণি থেকে। তাও আবার সব স্কুলে বাধ্যতামূলক নয়। খোদ ভারত— যেখানে নৃত্য ও চলচ্চিত্র শিল্পের অন্যতম এক প্রধান

৬

পৃথিবীর ১০২টি দেশের কারিকুলাম ঘেঁটে এই শিক্ষাক্রম করা হয়েছে; এর মধ্যে এমন কোনো দেশ কি আছে, যেখানে প্রথম শ্রেণির শিশুদের নৃত্য শেখানো হয়? ২০২৩ সালে প্রথম শ্রেণির জন্য সঙ্গীতের বই ছাপানো হয়েছে।

২৭. শিক্ষক সহায়িকা, প্রথম শ্রেণি, ৬ নং বই।
২৮. শিক্ষক সহায়িকা, প্রথম শ্রেণি, ৫ নং বই।

দেশ— দর্শক এবং বাজার আকর্ষণে সেখানেও তো প্রথম শ্রেণি থেকে শিশুদেরকে সঙ্গীত বা নৃত্য শেখানো হয় না। তাহলে বাংলাদেশে এটা এতটা জরুরি হয়ে গেল কেন? এ ছাড়া ইংরেজি বইয়ের ৮৯ ও ৯০ নম্বর পৃষ্ঠায় হিন্দুত্ববাদকে প্রমোট করা হয়েছে mammy cow, Brother Lion, Sister Parrot, Baby Spider ইত্যাদি শব্দগুচ্ছের পরিকল্পিত পাঠদানের মাধ্যমে।

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি) : ষষ্ঠ শ্রেণির *ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান* অনুশীলন বইয়ের ১৬-১৮ পৃষ্ঠায় 'আত্মপরিচয় : ব্যক্তিগত পরিচয় ও সংকট' অধ্যায়ে একটি ভালুকের গল্প এনে দাড়িকে কটাক্ষ করা হয়েছে ৬ বার। বইটিতে খুব কৌশলে বাংলার ইসলামি ইতিহাস ঐতিহ্যের শেকড় কেটে হিন্দুত্ববাদী ইতিহাসের বৈধতা খোঁজার একধরনের হীন প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। বিশেষত, বাংলার জনসাধারণের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিভিন্ন দেব-দেবীময় জাতিগোষ্ঠী ও সভ্যতার ইতিহাস বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (৭৭ পৃষ্ঠা)। মিসরীয় সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পুরো রচনাজুড়ে মিসরের শাসক ফেরাউনদের উন্নত সভ্যতা, উন্নত সংস্কৃতি, তাদের দেব-দেবী ও উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে (৫১-৭৬ পৃষ্ঠা)। অথচ তারা যে মানবতার দুশমন ছিল, তা সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এ দেশের মুসলিমরা ফেরাউনদের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাই পাঠ্যক্রমে মূর্তিপূজারি ফেরাউনদের উন্নত ও সভ্য জাতি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অপরদিকে মুসলিম আমলে এসে বিকৃত ও বানোয়াট ইতিহাস কাঠামো হাজির করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, উক্ত বইয়ে বাঙালির আজন্মশত্রু হিন্দুত্ববাদী অত্যাচারী আর্যদেরকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে (১২৫ পৃষ্ঠা)। যে মুসলমান আগমনের মধ্য দিয়ে এখানকার ভূমিপুত্ররা বাংলা ভাষা ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রপরিচয়ের স্বাধীনতা লাভ করে; সেই মুসলমান শাসকদের দেখানো হয়েছে বহিরাগত, আক্রমণকারী ও দেবালয় ধ্বংসকারী হিসেবে (৯৮ পৃষ্ঠা)। মৌর্য থেকে আদ্যকাল পর্যন্ত বাংলায় ঐতিহাসিকভাবে কারা কারা বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে, সেবার মধ্য দিয়ে সম্পর্ক গড়েছে আর কারা এ দেশে বিভিন্ন সময়ে নানা ষড়যন্ত্র ও নিপীড়ন করেছে, সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে বন্ধু-শত্রুদের চিত্রায়িত না করে ঢালাওভাবে বাংলার শত্রুপক্ষের গুণগান হাজির করা হয়েছে।

সপ্তম শ্রেণির *ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান* বইয়ে বাংলাদেশের কোনো প্রত্নস্থান কিংবা ঐতিহাসিক স্থাপনার ছবি দেওয়া হয়নি। কিন্তু বইয়ে পাটালিপুত্রের ধর্মীয় স্থাপনার (মন্দির) ছবি দেওয়া হয়েছে, যার সাথে বাংলার কোনো সম্পর্ক নেই। উয়ারী-বটেশ্বর, মহাস্থানগড়, কুমিল্লার ময়নামতি, ষাটগম্বুজ মসজিদ, কান্তজীর মন্দির কিংবা বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থান, ঐতিহাসিক স্থাপনা বইয়ের প্রচ্ছদে স্থান দেওয়া যুক্তিযুক্ত হতো। কিন্তু প্রচ্ছদে পদ্মফুল, জবাফুল কিংবা ময়ূরের ছবি সংযুক্ত করে বইয়ের লেখকরা অবনত মস্তিষ্কে হিন্দুত্ববাদের ইতিহাস শাখার প্রজেক্ট লেখক হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন। মলাটের ভেতরে ইন্দিরা গান্ধীর বৃহদাকৃতির ছবি দেখলেই মনে হবে এটি ভারতের ইতিহাসবিষয়ক বই। বাংলাদেশের ইতিহাস বই হলেও তাতে বাংলাদেশের কোনো মানচিত্রের ঠাঁই হয়নি। বইয়ের মাঝে মুসলিম শাসকদের বহিরাগত, দখলদার এবং আক্রমণকারী ও বর্বর হিসেবে প্রমাণ করেই লেখকগণ ক্ষান্ত হননি; বরং ব্রিটিশ আমলের আশরাফ-আতরাফ শ্রেণি বিভাজনকে সুলতানি আমলে টেনে এনে ইতিহাসের

উপর ভয়ংকর মিথ্যাচার আরোপ করেছেন (১১৫ পৃষ্ঠা)। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ শাসন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেও সেখানে মহিমান্বিত করা হয়েছে, কৌশলে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ইংরেজ ও জমিদারদের নানা অত্যাচার ও নিপীড়নকে (১১৯ পৃষ্ঠা)।

বইয়ের ১৩০ নং পৃষ্ঠায় ইংরেজ আমলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে ইতিবাচক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল ইংরেজদের শোষণের হাতিয়ার। প্রজাদের শোষণ করে যেসব জমিদার মোটা অঙ্কের রাজস্ব আদায় করে দিতে পারত, তাদেরকেই স্থায়ীভাবে জমিদারি দেওয়া হতো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রজাদরদি জমিদাররা জমিদারি হারায়। পক্ষান্তরে নব্য শোষক শ্রেণি তৈরি হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশে দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। আলোচিত *সামাজিক বিজ্ঞান* বইয়ের ১১৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—

> ইতিহাসের এই মন্দটুকুও তোমাদের জানতে হবে। সুলতানি আমলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। তোমরা হয়তো জানতে চাইতে পারো দাসপ্রথা কী? দাসপ্রথা হলো অমানবিক একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে মানুষের কেনাবেচা হতো। এই ব্যবস্থায় ধনীরা ব্যক্তিকে কিনে নিত এবং ক্রীত ব্যক্তি তার সম্পত্তি হিসেবে যেকোনো কাজ করতে বাধ্য থাকত। সুলতানি আমলেও এই দাসপ্রথার মাধ্যমে মানুষের কেনাবেচা হতো। দাসগণ অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করত। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না। সুলতানি আমল ও মুঘল আমল শেষে ব্রিটিশ উপনিবেশের মধ্যভাগে আইন করে এই অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।

অথচ বাস্তবতা হলো– সুলতানি আমলের পূর্বেও দাসপ্রথা ছিল এবং দাসদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হতো। আর মুসলিম সমাজে দাসপ্রথা চালু থাকলেও অমানবিক আচরণ করা হতো না। দাসরা যোগ্যতা অনুসারে সমাজে সম্মানিত হতেন– সেনাবাহিনীর কমান্ডার হতেন, এমনকি শাসকও হতেন। দিল্লির সুলতানদের মধ্যে প্রথম কুতুবউদ্দিন আইবেকের অধীনে আসে বাংলা। আর কুতুবউদ্দিন আইবেক নিজেই একজন দাস ছিলেন। সুতরাং প্রকৃত তথ্য সহজেই অনুমেয়। ষষ্ঠ শ্রেণির *ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান* বইয়ের ৫২ পৃষ্ঠায় রোদ, পানি, বৃষ্টি না লিখে পানির স্থলে 'জল' লেখা হয়েছে। অথচ বাঙালি মুসলমানের দীর্ঘ ইতিহাসের বয়ানে 'পানি' একটি চিরাচরিত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

একই বইয়ের প্রচ্ছদ ছবিতে ফুটিয়ে তোলা কৃষাণীর সাথে বাংলার কৃষাণীর যেন আকাশপাতাল তফাত। এ ছাড়া প্রচ্ছদে চিত্রিত পদ্ম ভারতের জাতীয় ফুল। আমাদের জাতীয় ফুল শাপলা, অথচ বইয়ে শাপলার কোনো উপস্থিতি নেই। ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখি, আমাদের জাতীয় পাখি দোয়েল। বইয়ে দোয়েলেরও কোনো খবর নেই। শুধু তাই নয়, অপ্রাসঙ্গিকভাবে বইয়ের মধ্যে দেব-দেবীর ছড়াছড়ি দেখা গেলেও এই ভূখণ্ডের ৯০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী মসজিদের চিত্র একবারও ব্যবহার করা হয়নি। বইয়ে উল্লিখিত কিছু দুর্বোধ্য ও বিদেশি শব্দ— যেগুলোর সাবলীল বাংলা করা সম্ভব— তা না করে অনেকক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দ এবং দুর্বোধ্য সংস্কৃতজাত শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নাম হিসেবে যেসব শব্দ নিয়ে আসা হয়েছে, তাতেও একধরনের গা-ছাড়া ভাব পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার্থীর নামে 'ফ্রান্সিস' কিংবা 'অনুসন্ধান' ব্যবহার এদেশে পরিচিত কি না সন্দেহ! শুধু তাই নয়, প্রতিটি অধ্যায়ে খুশি আপাকে দিয়ে জোর করে গল্প বানিয়ে শিক্ষার্থীদের গলাধঃকরণের প্রচেষ্টা বইটিতে লক্ষণীয়।

সপ্তম শ্রেণির *সামাজিক বিজ্ঞান* বইয়ের ১-১০৯ পৃষ্ঠায় আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলার মুসলমানগণ 'গোসল'কে 'গোসল' বলে, অন্যদিকে হিন্দুরা বলে 'স্নান'। আমাদের ভাষাগত সংস্কৃতিতে এটা গোসল, স্নান নয়। গোসলখানাকে এই দেশের মানুষ স্নানাগার বলে না, গোসলখানা-ই বলে। অথচ সপ্তম শ্রেণির *সামাজিক বিজ্ঞান* বইয়ের ১৮ পৃষ্ঠায় 'গোসলখানা'কে 'স্নানাগার' বলা হয়েছে। এ ছাড়া, পুরো আলোচনায় হিন্দু ও বৌদ্ধদের উন্নত সভ্যতা, উন্নত সংস্কৃতি, তাদের দেব-দেবী ও নগরায়ণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই বই পড়লে মনে হবে মানবজাতির ইতিহাস মানেই হলো মূর্তিপূজা, দেব-দেবীর ইতিহাস— পৃথিবী গড়ে উঠেছে মুশরিক ও মূর্তিপূজারিদের মাধ্যমে। এভাবে কোমলমতি শিশুদের মাথায় তারা বিষ ঢেলে চলেছে।

সপ্তম শ্রেণির *ইতিহাস ও সামাজিক* বিজ্ঞান বইয়ের ৫১ পৃষ্ঠায় শরীফা নামে একটা গল্প আছে। সেখানে শরীফা মূলত একজন ছেলে, যার নাম ছিল শরীফ। হঠাৎ একদিন তার মনে হলো সে মেয়ে, তখন থেকে সে নিজেকে মেয়ে বলেই পরিচয় দেওয়া শুরু করে। তার নাম রাখা হয় শরীফা। এখন যদি শরীফা বিয়ে করে, তাহলে সে একজন ছেলেকে বিয়ে করবে। এদিকে শরীফাও মূলত একজন ছেলে। বোঝাই যাচ্ছে, এই গল্পে সমকামিতাকে প্রমোট করা হয়েছে, যা কোনো মুসলিম মানতে পারে না। উক্ত বইয়ের অন্যতম লেখিকা পারভীন জলী একজন উগ্র নারীবাদী ও সমকামিতার প্রচারক। পারভীন জলী তার ফেসবুক আইডিতে প্রকাশ্যে সমকামিতা প্রমোট করেন। অথচ সমকামিতা যেমন ধর্মীয় দৃষ্টিতে নিষেধ, তেমনি নিষেধ বাংলাদেশের দণ্ডবিধি অনুযায়ীও। সংবিধানের ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী এটি একটি ফৌজদারি অপরাধ। অথচ অনলাইনে প্রকাশ্যে এই সমকামিতার প্রচারকারী পারভীন জলীদের দিয়ে লেখানো হয়েছে আমাদের আগামী প্রজন্মের পাঠ্যবই। বইয়ে সমকামিতাকে বাস্তব জীবনেরই একটা 'স্বাভাবিক' অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সেইসাথে একে জেনেটিক এবং জন্মগত সাব্যস্ত করে নৈতিক বৈধতাও দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই, এরা নিজেদের বিকৃত মস্তিষ্ক দিয়ে আমাদের কোমলমতি শিশুদেরও মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটাতে চায়।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের মতো একটি সমালোচনামূলক তত্ত্বকে ষষ্ঠ শ্রেণির *ইতিহাস* ও *সামাজিক বিজ্ঞান* বইতে হাজির করা হয়েছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের এটা জানানোর কোনো জরুরত ছিল না। সমগ্র বই পড়ে মনে হয়েছে, পাঠ্যবইটি প্রস্তুত করার সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মানসিক বিষয়টি লেখকরা বিবেচনায় আনেননি। পক্ষান্তরে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তারা কী ধরনের মানুষ হিসেবে দেখতে চান, সেই প্রোপাগান্ডা পাঠ্যবইয়ে হাজির করেছেন।

বাংলা সাহিত্য (৬ষ্ঠ ও ৭ম) : ষষ্ঠ শ্রেণির *বাংলা* বইয়ে আব্দুল্লাহ আল-মুতীর লেখা 'কীটপতঙ্গের সাথে বসবাস' নামে একটি পরিচ্ছেদ আনা হয়েছে। অথচ, বাংলার মতো একটি বিষয়ের সাথে এটি কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ তা বিবেচনার দাবি রাখে। উক্ত বইয়ের ৭১ পৃষ্ঠায় সেলিনা হোসেনের একটি প্রবন্ধ রয়েছে 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন' নামে। সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম সমাজের প্রতি ঘৃণা ছড়ানো হয়েছে। একই সাথে ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিধান 'পর্দার' ব্যাপারেও ঘৃণা ছড়ানো হয়েছে। শুধু তাই নয়,

জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলো' ও 'আমার দেখা নয়া চীন'-এর মতো চ্যাপ্টার রাখা ভাষার উপলব্ধির দিক থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির একজন ছাত্রের জন্য কতটুকু প্রযোজ্য, তা পর্যালোচনার দাবি রাখে। সপ্তম শ্রেণির *বাংলা* বইয়ের ৯৫ পৃষ্ঠায় আনিসুজ্জামানের একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে 'কত কাল ধরে' শিরোনামে। এই প্রবন্ধের মূল বিষয় হলো— বাংলার মানুষ হিসেবে আমরা কেমন ছিলাম, আমাদের আচরণ কেমন ছিল, আমাদের পোশাক কেমন ছিল ইত্যাদি। প্রবন্ধে আনিসুজ্জামান যা উল্লেখ করেছেন, তার সবই হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি। যেমন : আমাদের পূর্বের লোকেরা সবাই ধুতি পরত, মেয়েরা বহরে ছোট শাড়ি পরত, কপালে টিপ দিত ইত্যাদি। খাদ্য সংস্কৃতিতে ছাগলের গোশতের কথা আছে, গরুর গোশতের কথা নেই; যেন সবাই এদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ছিল। অথচ এই সভ্যতা গড়ে ওঠে একেশ্বরাবাদী দ্রাবিড়দের মাধ্যমে। আমাদের বাচ্চাদের শেখানো হচ্ছে— আমরা আগে সবাই হিন্দুয়ানিতে অভ্যস্ত ছিলাম।

ভাস্কর্য, মূর্তি এগুলো বানানো ইসলামে নিষিদ্ধ। যেহেতু ইসলামে নিষিদ্ধ তাই এগুলোকে জনপ্রিয় করতে হবে— এমন মিশন নিয়ে নেমেছে পাঠ্যপুস্তক রচনাকারী ইসলামবিদ্বেষীরা। সপ্তম শ্রেণির *বাংলা* বইয়ের ২০ পৃষ্ঠায় একটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, যার নাম— 'কত দিকে কত কারিগর'। লিখেছেন সৈয়দ শামসুল হক। এখানে ভাস্কর্য নির্মাতাদের গুরুত্ব দিয়ে তাদের তথাকথিত শিল্পকর্মের প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়েছে। 'বাংলা নববর্ষ' নামে শামসুজ্জামান খানের যে লেখাটি দেওয়া হয়েছে, তাতে 'পহেলা বৈশাখ'-কে বাঙালির সর্বজনীন উৎসব হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং এ উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রাকে খুবই বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। অথচ বাংলার মানুষ হাজার বছর ধরে তাদের নিজস্ব ধর্মানুসারে বিভিন্ন উৎসব পালন করে আসছে। তার মধ্যে পহেলা বৈশাখ খুব ছোট্ট আকারেই হাজির হয়। ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আজহা বাঙালির এখন পর্যন্ত সর্বজনীন উৎসব। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ২ শতাংশ শহুরে মানুষের পালন করা উৎসবকে 'সর্বজনীন' বলে বিকৃত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ বয়ান হাজির করা হয়েছে। বাংলাদেশের বামপন্থি সেক্যুলাররা সব সময় এভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করতে বিভিন্ন বিষয় ও অনুষঙ্গকে আরোপণমূলকভাবে সর্বজনীন হিসেবে ঘোষণা দিয়ে আসছে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা (৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণি) : ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির *স্বাস্থ্য সুরক্ষা* বইয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবাধ মেলামেশার (ফ্রি মিক্সিং) বিস্তার দেখানো হয়েছে। একসাথে খেলাধুলা করা, স্কুলে যাওয়া থেকে শুরু করে ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের কাজের সমন্বয়ে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা উৎসাহিত করা হয়েছে। ৭ম শ্রেণির বইয়ের ৫৩ পৃষ্ঠায় অন্তরা ও ফাহিমের মাঝে চলে আসা ফ্রি মিক্সিং ও সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজনদের পক্ষ থেকে বকা দেওয়ার গল্প লেখা হয়েছে। এর ফলে নাকি তারা আরো খারাপ হয়ে যায়। এটা নিয়ে কীভাবে কী করা যায়, তা ছাত্রছাত্রীদের ভেবে পাঠ তৈরির কথা বলা হয়েছে। বাস্তবিকভাবে যে সমস্যাটি (ফ্রি মিক্সিং) দিনদিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, সেটাকে অবাধে চলতে দিয়ে আবার ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বলা হচ্ছে সমস্যার সমাধান বের করতে— এর থেকে অবাস্তব চিন্তা আর কি হতে পারে! ৬ষ্ঠ শ্রেণির *স্বাস্থ্য সুরক্ষা* বইয়ের ২৩ নম্বর পৃষ্ঠায় মনের যত্নের কথা বলা হয়েছে। মন ভালো

রাখার জন্য অনেক ধরনের জাগতিক ভালো কাজ করা যায়। নিজেকে কাজের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে পারলে অনেক সময় মন ও মানস অনেক ভালো থাকে। কিন্তু, আত্মিক প্রশান্তিটা অধিকাংশ সময়ে নিজ নিজ ধর্ম পালনের ভেতর দিয়েই মানুষের মাঝে হাজির হয়। শুধু জাগতিক কাজ যা সম্পূর্ণরূপে পালন হয় না। এই বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়নি।

শিল্প ও সংস্কৃতি (৬ষ্ঠ ও ৭ম) : নতুন পাঠ্যক্রমে যুক্ত হওয়া ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির *শিল্প ও সংস্কৃতি* বইটির ভেতরে প্রবেশ করলে অবাক না হয়ে উপায় নেই। তামাম বইয়ে শিল্প ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের নামে তুলে ধরা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র বন্দনায় নিয়োজিত সেক্যুলার কমিউনিস্টদের চাহিদামাফিক শিল্প ও সংস্কৃতির বিষয়গুলো। দীর্ঘকাল ধরে এগুলো গোটা বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলে আসছে। অথচ এই সংস্কৃতি না বাঙালি মুসলমানের, না এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের; বরং অধিকাংশই শান্তিনিকেতন থেকে আমদানি করা। বই পড়তে গেলে মনে হবে যেন রবীন্দ্রনাথের চোখে, শান্তিনিকেতন, ছায়ানট, চারুকলা আর উদীচীর চোখে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে মূল্যায়নের অপচেষ্টা করা হয়েছে। ৭ম শ্রেণির বইটিতে 'বৈচিত্র্যে ভরা বৈশাখ' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলাদা একটি পাঠই কায়েম করা হয়েছে এবং উদ্ধৃত করা হয়েছে তার বৈশাখ বন্দনা গান 'এসো হে বৈশাখ'। এই অধ্যায়ে আরও বলা হয়েছে– বৈশাখী উৎসব উদ্‌যাপনের জায়গাটি নাকি সাজানো হয় কুলা, ডালা, মুখোশসহ বিভিন্ন দেশীয় জিনিস দিয়ে (পৃষ্ঠা ৩৪)।

অথচ আবহমানকাল থেকে গ্রামগঞ্জে বৈশাখ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলায় কখনো এসব হিন্দুয়ানি সংস্কৃতির আধিপত্য দেখা যায়নি। আলোচ্য অধ্যায়ে বেশ পরিমাণে বানান ভুলও লক্ষণীয়। বইটির ৬৪ পৃষ্ঠায় নৌকাবাইচের একটি চিত্র দেওয়া হয়েছে, যাতে দেখা যাচ্ছে বৈঠাচালকদের উৎসাহ জোগাতে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিদের হাতে ঢোল আর একতারা। নৌকাবাইচে বৈঠাচালকদের উৎসাহ দেওয়া লোকের হাতে ঢোল এবং একতারা, বিষয়টা বড়ই অদ্ভুত! এমনটি কেউ দেখেছেন কি না আমাদের জানা নেই। মাটি ও মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে না তুললে ভুল বোঝাবুঝি হওয়াটাই স্বাভাবিক হয়ে যায়। ৬৯ পৃষ্ঠায় লীলা মজুমদারের 'আমি' নামে একটি গল্প সংযুক্ত করা হয়েছে। লীলা মজুমদার ১৯৭৫ সাল থেকে বসবাস করেন শান্তিনিকেতনে। পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কারও। 'মায়ের মুখের মধুর ভাষা' অধ্যায়ে গাওয়া হয়েছে কবিয়াল রমেশ শীলের গুণগান, যিনি সাড়ে তিনশরও অধিক মাইজভান্ডারি গানের রচয়িতা। মজার বিষয় হচ্ছে, এই রমেশ শীল ছিলেন একজন কমিউনিস্ট। তার থেকেও অনেক বড় মাপের কবিয়াল, বাউল ও সংগীতশিল্পী বাংলায় থাকলেও তাদের কথা সেভাবে উঠে আসেনি। 'শরৎ উৎসব' অধ্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ রচিত নাটক। মোটকথা, গোটা বইয়ে সচেতনভাবে মুসলিম ও ইসলামি শিল্প, সংস্কৃতিকে নিদারুণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণির *শিল্প ও সংস্কৃতি* বইয়ের প্রচ্ছদে দেওয়া হয়েছে ময়ূর ও পদ্ম ফুলের ছবি। এগুলোর সাথে বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের কোনোরূপ মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

মুসলিম শিল্পকলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মুসলিম চিত্রকলা, যেটি ক্যালিগ্রাফি হিসেবে পরিচিত। বাঙালি নানাবিধ চিত্রকলা গুরুত্ব পেলেও বইয়ে মুসলিম চিত্রকলা উপস্থাপনে

লেখকদের উন্নাসিকতা স্পষ্ট হয়েছে। ২৬ পৃষ্ঠায় 'নব আনন্দে জাগো' পাঠটি শুরু হয়েছে চৈত্রসংক্রান্তি পালনের কথা দিয়ে। বাঙালিরা নাকি বছরের শেষদিন হিসেবে চৈত্রসংক্রান্তি পালন করে থাকে। অথচ এটি বাঙালির সর্বজনীন উৎসব তো নয়ই; বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানের কোনোদিনও এমন সংস্কৃতি ছিল না। এখন বলা হচ্ছে– পহেলা বৈশাখ বাঙালির নববর্ষ ছিল, চৈত্রসংক্রান্তিই তার প্রমাণ। বাঙালিবাদীরা এই চৈত্রসংক্রান্তি ঘটা করে পালন করে দেখাতে চান যে, এটিও আবহমান বাংলার সংস্কৃতি। চৈত্রসংক্রান্তি হলো হিন্দুদের বর্ষ শেষের পূজা। এটি তাদের বারো মাসের তেরো পার্বণের একটি। বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠান এই পূজাকে কেন্দ্র করে চলে। আতোয়ার রহমান লিখেছেন–

> লম্বা একটি খুঁটির মাথায় আড়াআড়িভাবে একটি দণ্ড বেঁধে তৈরি হয় চড়কগাছ। কোনো মন্দির প্রাঙ্গণে অথবা বারোয়ারীতলায়। দণ্ডটির দুই মাথায় ঝোলানো রশির প্রান্তে থাকে বান-বড়শির আকারের আংটা। এই আংটা পিঠে গেঁথে নাগরদোলার মতো দোল খাওয়া বা ঘোরা একদা ছিল কিছু ভক্তের দেবভক্তি প্রকাশের প্রিয় অনুষ্ঠান। বর্ষ শেষের এ উৎসব হিন্দুসমাজে অন্যদের ভেতর উদ্‌যাপিত হয় অরন্ধনের মাধ্যমে চৈত্রসংক্রান্তি রূপে। এদিনে আহার্য রূপে গ্রহণীয় শুধু মুড়ি-মুড়কি, মিষ্টান্ন বা ফলমূল। অন্ন-ব্যঞ্জনের মতো অগ্নিপক্ব নিত্যদিনের আহার্য চৈত্রসংক্রান্তিতে বর্জনীয়।[২৯]

হিন্দু পূজার এই প্রথা-পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে ধর্মনির্বিশেষে সর্বজনীন উৎসব। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, বাঙালি মুসলমান তার আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে বাঙালি হিন্দুর ধর্মীয় ভাব ও প্রথাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করুক। অন্যকথায়, এক ধরনের 'সাংস্কৃতিক ধর্মান্তর' ঘটুক। এ দেশের বাঙালিবাদীদের দূরতম লক্ষ্য হলো– এসব অনুষ্ঠান প্রচলনের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানকে সাংস্কৃতিকভাবে হিন্দু বানিয়ে দেওয়া। কিন্তু হিন্দু শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না বলে বলা হয় বাঙালি।

ইংরেজি (৬ষ্ঠ ও ৭ম) : ২০২১ শিক্ষাক্রমের ৬ষ্ঠ শ্রেণির *ইংরেজি* বইকে ব্যবহারিক শিক্ষার আলোকে বিবেচনা করলে বইয়ের অধ্যায়গুলোকে বেশ খাপছাড়া বলে মনে হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে 'Little Things' নামে একটি কবিতা লিখতে বলা হয়েছে, অথচ কোনোরূপ ধারণা দেওয়া হয়নি। বাদশাহ আকবর ও বীরবলের মাঝে একটি কাল্পনিক ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি কিং লেয়ার ও তার মেয়েদের মধ্যে কথোপকথনের একটি কাল্পনিক গল্পও উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ চাইলে সত্য ঘটনার ভেতর দিয়েও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষা দেওয়া যেত। আগের পাঠ্যক্রমে 'An Unseen beauty of Bangladesh' নামে একটি পাঠ থাকলেও এবার তেমন কিছু নেই। কিছু পরিকল্পিত ব্যক্তি ও কিছু পরিকল্পিত দিবসের জ্ঞানার্জন ব্যতীত নতুন কিছু আলোচ্য পাঠক্রম থেকে শিখে ওঠা দুঃসাধ্য।

৭ম শ্রেণির *ইংরেজি* বইয়েও একই অবস্থা লক্ষণীয়। অতিরঞ্জিতভাবে স্বাধীনতা, ৭১, শেখ মুজিবুর রহমানের আলাপ তোলা হয়েছে। অথচ অর্থপূর্ণ কোনো চ্যাপ্টার রাখা হয়নি, যা পড়ে একজন ছাত্রের মন-মগজে একটা বৈচিত্র্যপূর্ণজ্ঞান তৈরি হবে। মুসলিম

---

২৯. *উৎসব*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।

অভিবাদনে সালাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু সেই সালাম *ইংরেজি* বইয়ের বরাত থেকে হারিয়ে গেছে। *ইংরেজি* বইয়েরও পাতায়-পাতায় ফ্রি মিক্সিংয়ের ছড়াছড়ি। একজন মেয়ের সাহায্য লাগলে একজন ছেলের থেকে সাহায্য চাওয়া। আবার উল্টোটাও ঘটে। এর ভেতর দিয়ে সমাজে দীর্ঘ সময় ধরে যে ধর্মানুভূতির প্রকাশ, তার বিলুপ্তি ঘটছে।

বিজ্ঞান (অনুশীলন ও অনুসন্ধানী পাঠ) ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণি : ২০২৩ সালের নতুন *বিজ্ঞান* বইকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 'অনুশীলন' ও 'অনুসন্ধানী' দুইটি বই। ৬ষ্ঠ শ্রেণির *বিজ্ঞান* (অনুসন্ধানী পাঠ) বইয়ের ভেতর প্রবেশ করলে বেশ কয়েকটি বিষয় সামনে আসে, যেগুলো আলোচনার দাবি রাখে। পৃষ্ঠা ৪-এ অযৌক্তিক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ উদাহরণ টানা হয়েছে এবং ওই কেন্দ্রিক অনুশীলনীর প্রশ্নে বলা হয়েছে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার বিবরণ পেশ করতে (১৩ পৃষ্ঠা)। একই পৃষ্ঠায় যে আলাপ তোলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এখানে একক না বুঝিয়ে রাশির নামগুলো জানালেই যথেষ্ট হতো। ১৬ পৃষ্ঠায় ঘনত্ব বোঝানোর ক্ষেত্রে সূত্রের ব্যবহার করা হয়েছে, যা খুবই অপ্রয়োজনীয় ও বেখাপ্পা। ২৫-২৬ পৃষ্ঠায় কোষের ধারণা দিতে কোষ বিভাজনের মতো কঠিন বিষয় নিয়ে আসা হয়েছে। ৪০ পৃষ্ঠায় মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিভাগ দেওয়া হয়েছে, যা একান্তই অপ্রয়োজনীয় ছিল। ৪০-৪৭ পৃষ্ঠায় অনুজীবের (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ভাইরাস) আলোচনা এত কঠিন করা হয়েছে, যা অনেকটাই দুর্বোধ্য পর্যায়ের। অথচ চাইলে এটিও অনেক সহজ করা যেত। ৬৫-৬৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এমন ধরনের পৌরাণিক কাহিনির ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, যা হিন্দুত্ববাদকে প্রমোট করে। নক্ষত্রমণ্ডলীর রাশি (তুলা, কর্কট) উপস্থাপন করা হয়েছে।

বইটির বিভিন্ন জায়গায় ভুল শব্দের ছড়াছড়ি। পাশাপাশি ৮৫ পৃষ্ঠায় শক্তির প্রকারভেদকে অনেক বেশি জটিল করা হয়েছে। বইয়ের ভেতর অমুসলিম বিজ্ঞানীদের ছড়াছড়ি থাকলেও মুসলিম বিজ্ঞানী বলতে যে পৃথিবীতে কিছু ছিল, তার কোনো অস্তিত্বই সেখানে উল্লেখ করা হয়নি। ৬ষ্ঠ শ্রেণির 'অনুশীলন' বইয়ের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা লক্ষণীয়। পুরাণের গল্পে (১১ পৃষ্ঠা) 'কালপুরুষ' নামক বিষয়বস্তু তুলে আনা হয়েছে, যাকে হিন্দুত্ববাদের প্রচারণা বলা যায়। এ ছাড়া ৫২ পৃষ্ঠায় 'রোদ, জল বৃষ্টি' নামক চ্যাপ্টারে পানির বদলে পরিকল্পিতভাবে হিন্দুয়ানি শব্দ জল ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এখানকার জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণের সাথে তা সাজুয্যপূর্ণ নয়। ৮৮ পৃষ্ঠায় নৈতিকতাবর্জিত একটি গল্প উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতার্থে এই পাঠ শিক্ষাক্রমের সাথে কতটুকু সাজুয্যপূর্ণ সেই প্রশ্ন ওঠে। শব্দচয়নের (গ্যাঁড়াকল) ক্ষেত্রেও ব্যাপক সতর্কতা জরুরি ছিল। বইয়ের আধেয় (content) দেখলেই স্পষ্ট হয়, কতটা অমনোযোগের সাথে কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ শ্রেণির *বিজ্ঞান* (অনুশীলন পাঠ) বইয়ের ১১ পৃষ্ঠায় তারার বিন্যাস নিয়ে আলোচনায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরাণের গল্প উপস্থাপন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষার্থীদের কাজ দেওয়া হয়েছে, তারাও যেন এমন কাল্পনিক গল্প বানায়। কাল্পনিক কাহিনি বানানো এখন *বিজ্ঞান* বইয়ের অনুশীলন! *বিজ্ঞান* বইয়েও তারা পুরাণকে ঢুকিয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণির *বিজ্ঞান* (অনুশীলন) বইয়ের ১৩৬ পৃষ্ঠায় জাফর ইকবাল একটি রূপকথার গল্প লিখেছেন। দুর্ভাগ্য আমাদের, *বিজ্ঞান* বইকে রূপকথার বই বানানোর অপচেষ্টা দেখতে হলো। ষষ্ঠ শ্রেণির *বিজ্ঞান* (অনুশীলন পাঠ) বইয়ের ১১ অধ্যায়ে 'মানব শরীর' শিরোনামের প্রবন্ধে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক অবস্থার যেসব বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত নির্লজ্জ

ও অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। কোমলমতি শিশুদের যে এসব বিপথগামী করবে, তা যেকোনো সচেতন মানুষই উপলব্ধি করতে পারে।

এখানেই শেষ নয়, মুসলমানরা তাদের দেখা-সাক্ষাতের শুরুতে সালাম দেওয়ার রীতি অনুসরণ করে থাকে– হোক সেটা ক্লাসরুম কিংবা যেকোনো জায়গায়। নতুন শিক্ষাক্রমে পরিকল্পিতভাবে ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণির ইংরেজি বই থেকে সেটিও সরানো হয়েছে। *বিজ্ঞান* (অনুসন্ধানী পাঠ) ৭ম শ্রেণির পৃষ্ঠা ৮৫-এ ভূ-প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনাবিষয়ক স্থানীয় লোকগাথা, প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাসের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে ভূমিকম্প, বন্যা, শিলাবৃষ্টি সম্পর্কিত লোকগাথা, প্রচলিত কাহিনি বর্ণিত আছে। এ বিষয়গুলো বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন ছিল না। এগুলোর সাথে বিজ্ঞান কিংবা বাস্তবতার যে সম্পর্ক নেই, সেটি উল্লেখ করা হয়নি। এ ছাড়া পৃষ্ঠা ৯৭-এ মহাদেশ ও টেকটনিক্সের আলাপ উপস্থাপন করা হয়েছে, যদিও বিজ্ঞানের তথ্যমতে টেকটনিক্স বিষয়টা ১০০ শতাংশ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়।

সর্বোপরি, এ বিষয়টা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করা যেত, উচ্চতর অধ্যয়নের বিষয় হতে পারত এটি। ৭ম শ্রেণির *বিজ্ঞান* (অনুশীলন) বইয়ের পৃষ্ঠা ২-এ একটি ছবি দেওয়া হয়েছে– শেখ হাসিনা, সজীব ওয়াজেদ জয়সহ আরেকজন ব্যক্তির। জাতীয় পাঠ্যপুস্তকের *বিজ্ঞান* বইয়ে বাংলাদেশের কোনো গবেষক বা বিজ্ঞানীর ছবিসহ তাদের অর্জন দিলে শিক্ষার্থীরা বেশি অনুপ্রাণিত হতো। পদার্থের সুলুকসন্ধান/পদার্থের খোঁজখবর না দিয়ে 'পদার্থের গঠন' শব্দ ব্যবহার করা যেত। পৃষ্ঠা ৩-এ কল্প বিজ্ঞানের গল্প বা সায়েন্স ফিকশন নিয়ে ৭ম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থীর মাথা খাটানোর আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই; বরং বিজ্ঞানের কোনো বিষয় আবিষ্কারে বাস্তবিক পদক্ষেপ নিতে তাদের উদ্বুদ্ধ করাই হতো বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। পৃষ্ঠা ৪-এ ডাইনোসরের ফসিলসংক্রান্ত আলোচনা আনা হয়েছে। ডাইনোসরের বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের জন্য কাল্পনিক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিকও বটে। এ জায়গায় কুরআনে বর্ণিত কওমে লুত, ডেড সি, মিসরের পিরামিড এ ধরনের দৃশ্যমান এবং ঐতিহাসিক বিষয়গুলো সংযুক্ত করা অতীব প্রয়োজন ছিল। পৃষ্ঠা ১৬-তে পদার্থের সুলুকসন্ধানের ছবিটা সবচেয়ে বাজে হয়েছে। অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ছবি গুগলে আছে। কোষ পরিভ্রমণ বলতে লেখক যে বিষয়গুলো এনেছেন, সেগুলোর আসলে বাস্তবে কোনো প্রয়োজন নেই। সম্পূর্ণ অসম্ভব/কাল্পনিক চিন্তা আনা হয়েছে। এ বিষয়টি এইচএসসি পর্যায়ে জীব বিজ্ঞানের জটিল একটি অধ্যায়, ৭ম শ্রেণিতে এটি কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পৃষ্ঠা ৫৪-এ ভাইরাসের চিত্রটা খুবই কালারফুল হয়েছে। এর চেয়ে অনেক সুন্দর ছবি গুগলে আছে। পৃষ্ঠা ৬৪-এ টেরারিয়ামের ছবিটা দৃষ্টিকটু লেগেছে। পৃষ্ঠা ৭২-এ ভূমিকম্পের বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ টপিক; কিন্তু ভূমিকম্প রোধে Structure কীভাবে তৈরি করা উচিত, সে ব্যাপারে মৌলিক ধারণা দেওয়া হয়নি। পৃষ্ঠা ৭৭-এ ভূমিকম্পের টেকটোনিক প্লেটের নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এ ব্যাপারে মৌলিক ধারণা দেওয়া হয়নি। পৃষ্ঠা ৯৩-এ ভয়ংকর ডাইনোসরের ছবি দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের ছবি সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের মাথায় মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। লেখক নিজেই বলেছেন, এর সবই কাল্পনিক। বিজ্ঞানীরা এদের হাড়গোড় অনুমান করে ছবিগুলো এঁকেছেন। ১২৪ পৃষ্ঠায় আগ্নেয়গিরির ছবিটা ভালো আসেনি। এর চেয়ে ভালো মানের ছবি খুব সহজেই পাওয়া সম্ভব। কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার বিষয়টি আরও বিস্তারিত লেখার প্রয়োজন ছিল।

মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম ও পরিকাঠামো : মাধ্যমিক ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির বইগুলোর সাথে মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির স্বতন্ত্র বইগুলো বাদ দিয়ে বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞানসহ, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান বইগুলো হুবহু একই রাখা হয়েছে। এ ছাড়া মাদ্রাসার বইগুলোতে বাকি বিষয়গুলো পূর্বের মতোই হাজির রয়েছে, কোনোরূপ পরিবর্তন আসেনি। মাধ্যমিক পর্যায়ের পরিবর্তিত বিষয়গুলোর পর্যালোচনা ওপরে প্রদান করা হয়েছে। বই একই হওয়ার দরুন দ্বিরুক্তি করা হচ্ছে না। তবে একটা বিষয় খুবই জরুরি, মাদ্রাসা হোক কিংবা হাইস্কুল, উভয় বইয়েই ফ্রি মিক্সিংয়ের অবাধ ছড়াছড়িতে পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছে। মাধ্যমিক স্কুল পাঠ্যক্রমে কিছুটা পরিলক্ষিত হলেও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে পূর্বে এমনটা ছিল না।

মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম নিয়ে সরকার দীর্ঘকাল ধরে কোনো ধরনের আধুনিকায়ন চিন্তা হাজির করেনি, মাদ্রাসার পরিকাঠামো উন্নয়নে কোনোরূপ বিশেষ ভূমিকাও রাখেনি। মাদ্রাসায় বরাদ্দ সংকট থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকের সংকট দূরীকরণে সরকার কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়নি। বাংলাদেশের অসংখ্য মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হওয়ার পর্যায়ে দীর্ঘকাল ঝুলে আছে, সেগুলো নিয়ে কোনো নজর দেয়নি। শুধু তাই নয়, মাদ্রাসা পাঠ্যক্রমে থাকা আরবি বই-পুস্তকসমূহ দীর্ঘকাল ধরে একই রকম পড়ানো হচ্ছে। অথচ যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আরও বাস্তবভিত্তিক, মানসম্মত পাঠ্যক্রম সাজানোর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের এখনো অতিরিক্ত নম্বরে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন দ্বৈত নীতি কোনোভাবেই মানা যায় না। দীর্ঘকাল ধরে আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষায় ফাজিল ও কামিল বর্ষের পাঠ্যক্রম একই রকম। তাতে সময়োপযোগী পরিবর্তনের উদ্যোগ নেই বললেই চলে। মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক স্কুল-কলেজের শিক্ষাক্রমে ভারসাম্য আনতে গিয়ে দুইটাই অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। ফলে মাদ্রাসায় পড়ে এখন একদিকে বড়ো কোনো স্কলার তৈরি হচ্ছে না, অন্যদিকে স্কুল-কলেজ মাধ্যমে ভালো পড়ালেখা করেও প্রতীক্ষিত রেজাল্ট আসছে না। তাই দুইটা শিক্ষাক্রম নিয়ে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়াটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মাদ্রাসা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য ব্রিটিশরা ১৯২৮ সালে 'Board of Central Madrasa Examination Bengal' নামে একটি বোর্ড গঠন করে। আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা এই বোর্ডের অধীনে ছিল। পরে ঢাকায় আলিয়া মাদ্রাসা স্থানান্তরিত হওয়ার পর এই বোর্ডের নাম 'Madrasa Education Board' রাখা হয়। পদাধিকার বলে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালে বোর্ডকে মাদ্রাসা আলিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র বোর্ড হিসেবে স্থাপন করা হয়। এই বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত (affiliated) মাদ্রাসাসমূহ একই পাঠ্য তালিকা অনুসরণ করে। কিন্তু কালের পরিক্রমায় মাদ্রাসা শিক্ষাকাঠামো আর শিক্ষাক্রমে কোনোরূপ উন্নতি দেখা যায়নি। এর পেছনে অন্যতম কারণ বলা যায়— মাদ্রাসার সংখ্যা যেভাবে বেড়েছে, সরকার সেভাবে বোর্ডের সংখ্যা বাড়ায়নি। এ ছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষায় যে পরিমাণ আধুনিকায়ন প্রয়োজন, যথোপযুক্ত লোকবল নিয়োগের অভাবে সেখানে উন্নতির ছোঁয়া পায়নি।

জাতীয়
শিক্ষাক্রম ২০২০-এর

ভয়ানক কিছু দিক

- এতে ধর্মীয় বিষয়কে পরীক্ষার বাইরে রাখা হয়েছে। বর্ণবাদী এবং ত্রুটিপূর্ণ এই শিক্ষাক্রম এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, এখান থেকে নিষ্পাপ শিশুদের বের হওয়ার কোনো রাস্তাই খোলা নেই। কারণ, ১০টি বিষয়ের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিকশিক্ষা বিষয়কে পরীক্ষার বাইরে রেখে শিখনকালীন মূল্যায়নের মধ্যে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে সামাজিক বিজ্ঞান নামে ইসলামোফোবিক বিষয়টি বাধ্যতামূলক পরীক্ষার মধ্যে এনে শিশুদেরকে তা শিখতে বাধ্য করা হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে সেটা বাতিল করা হয়েছে।
- এটি বাংলার সমাজ কাঠামো ও ঐতিহ্যবহির্ভূত। এর মধ্য দিয়ে বাংলার আবহমানকালের সৌন্দর্য ও ঐতিহ্যবহির্ভূত পাঠ্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এখানকার মানুষের ধর্ম ও ঐতিহ্যের শেকড় বিচ্ছিন্ন করতে খোলাখুলিভাবেই সর্বত্র ব্রাহ্মণ্যবাদী বয়ান হাজির করা হয়েছে। এতগুলো বইয়ের মাঝে একটা জায়গাতেও ইসলাম, মুসলিম শব্দগুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি, ইসলাম ধর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা তো দূরের বিষয়। অথচ এই ভূখণ্ডের মানুষের ধর্ম ইসলাম। ধর্ম মানুষের প্রশান্তির জায়গা, বেঁচে থাকার জায়গা। শান্তির একমাত্র শেষ বাহন হলো ধর্মের কোলে নিজেকে সঁপে দেওয়া। সেই ধর্মই যদি পাঠ্যপুস্তকে স্থান না পায়, তাহলে এই জাতির জন্য ভবিষ্যতে বিয়োগান্ত মুহূর্ত আবির্ভাব হতে চলেছে, সেই আশঙ্কা করাই যায়।

- এই শিক্ষাক্রমে মুসলিম উৎসবমুখর দিনগুলোকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তার পরিবর্তে অধিকাংশ বইয়ে ছলেবলে কলে কৌশলে তথাকথিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের পহেলা বৈশাখ বিশাল অংশজুড়ে জায়গা নিয়েছে। ২০২১ সালের পাঠ্যক্রমের জন্য বাস্তবায়িত বইগুলোতে অতিমাত্রায় রবীন্দ্রনাথকে হাজির করা হয়েছে। পাশাপাশি, হিন্দু লেখকদের স্থান দেওয়া হয়েছে অনেক বেশি। মুসলিম নামধারী কিছু লেখক জায়গা পেলেও তাদের অধিকাংশ আবার কমিউনিজমের বুক চিরে উঠে আসা মুসাফির। ব্যতিক্রম খুব অল্পই।
- এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম পরিচয়ের প্রতিনিধিত্ব নেই। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে আমাদের মুসলিম সন্তানেরা তাদের আত্মপরিচয় জানবে এবং নিজস্ব সংস্কৃতিতে গড়ে উঠবে। দুঃখজনকভাবে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে আমাদের মুসলিম পরিচয় অনুপস্থিত। মুসলিম পরিচয়কে প্রতিনিধিত্ব করে এমন কোনো প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও ইলাস্ট্রেশন নেই। উল্টো মুসলিম পরিচয়ের সাথে সাংঘর্ষিক কন্টেন্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। ঢাকাকে বলা হয় মসজিদের শহর। অথচ সমগ্র *সামাজিক বিজ্ঞান* বইয়ে মসজিদের একটা ছবিও নেই। বিপরীতে আছে প্রচুর মন্দিরের ছবি। শিশুদের পাঠ্যবই দেখলে মনে হবে তারা মুসলিম না, সবাই মূর্তিপূজারি। যদিও শিক্ষামন্ত্রী বারবার জোর গলায় এসব মহাভুল ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বাস্তবিক অর্থে সরকারের সর্বশেষ সিদ্ধান্তের আলোকে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির *ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান* বইকে বাজেয়াপ্ত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, বর্তমান শিক্ষাক্রম পুরোটাই যে এখানকার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি প্রকল্প; তার সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেই। উপর্যুক্ত প্রেক্ষিতে আমাদের দাবি হলো, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতমুখী এই শিক্ষাক্রম ও তার আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক বাতিল করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে দেশপ্রেমিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী স্কলারদের সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদের মাধ্যমেই উপযুক্ত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন ঘটানো হবে বলে আশা রাখি।

জাতীয়
শিক্ষাক্রম ২০২০ নিয়ে

ছাত্রশিবিরের প্রস্তাবনা

১. শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশে ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের সম্মিলনে শিক্ষা কমিশন গঠন করে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ঈমান-আকিদা ও মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা।

২. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (৭ম অধ্যায়) অনুযায়ী সর্বপর্যায়ে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা ও স্ব-জাতীয় মূল্যবোধের শিক্ষার বাস্তবায়ন করা।

৩. দেশের কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের জন্য আলেমদের সমন্বয়ে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন গঠন করা। পাশাপাশি কওমি মাদ্রাসার গুণগতমান বজায় রাখার ওপর জোর প্রদান করা।

৪. মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়া। বিশেষ করে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের দক্ষ করা, বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করা, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সকল বৈষম্য দূর করা। মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী ভর্তি করার জন্য অভিভাবকদের উৎসাহদান করা। মাদ্রাসায় ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা। ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে সরকারিকরণ করা।

৫. শিক্ষাব্যবস্থার প্রত্যেক স্তরে কুরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক সর্বস্তরের পাঠ্যক্রমে কুরআন শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে কুরআন শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা।

৬. সাধারণ শিক্ষাধারার মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয়ের তালিকায় পালি ও সংস্কৃতির পাশাপাশি উর্দু ও ফারসির সংযোজন করা। উর্দু ও ফারসি ভাষা এ অঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষায় এগিয়ে থাকার জন্য স্প্যানিশ বা ফেঞ্চ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৭. দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর অশিক্ষিত অথবা স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা গঠিত নিয়ন্ত্রক পরিষদের কুপ্রভাব শিক্ষা কার্যক্রমের একটি অন্তরায়। তাই উচ্চশিক্ষিত উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রক পরিষদ গঠন করা প্রয়োজন।

৮. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর ২৮তম অধ্যায়ে শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে গৃহীত বিশেষ পদক্ষেপসমূহের মধ্যে ১৫ ও ১৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত এবং উচ্চশিক্ষা অধ্যায়ের ১১নং কৌশল অনুযায়ী– বাংলা ভাষার যথাযথ মান বজায় রাখা ও উন্নয়নে সুপারিশকৃত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এর পাশাপাশি ইংরেজি ও আরবি ব্যবহার অব্যাহত রাখা এবং তা যাতে বাংলার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

৯. উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে দিনব্যাপী ক্লাস এবং প্রতিদিন পরীক্ষা নেওয়ার মতো অকার্যকর, অযৌক্তিক পদ্ধতি বাতিল করে কৌশলগত স্বাভাবিক কার্যকর পদ্ধতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কর্মদক্ষ নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে চাহিদার আলোকে দেশের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ অবকাঠামোগত কৌশল বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

১০. উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় বরাদ্দ বাড়ানো। বর্তমানে আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা খাতের বাজেটের দিকে নজর দিলে দেখতে পাই— এ খাতে বাজেটের হার খুবই কম। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য গবেষণা খাতে বাজেট বাড়াতে হবে। পাশাপাশি বাজেটের একটা বড় অংশ উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে।

১১. বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। সকল প্রকার দলীয় নিয়োগ পরিহার করা, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার মূল্যায়ন নিশ্চিত করা। মেধাবী, যোগ্য, দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা। সরকারের প্রতি আহ্বান– শিক্ষক নিয়োগের পুরো প্রক্রিয়াটা মনিটরিং করে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

১২. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা অধ্যায় মোতাবেক দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের কৌশলসমূহ বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

১৩. জাতীয় শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনার জন্য রিসার্চস্কলারসহ দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদদের নিয়োজিত করা।

১৪. দেশ-কাল, ধর্মীয় আদর্শ, চিন্তাচেতনা ও মূল্যবোধের আলোকে বাংলা, ইংরেজি, আরবি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক তৈরির জন্য শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, লেখক, চিন্তাবিদদের নিয়োজিত করা।

১৫. পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের জন্য এমনভাবে গল্প ও কবিতা রচনা করতে হবে, যেন শিশুদের মাঝে এই শিক্ষা প্রতিবেশী ও বন্ধুদের প্রতি ভালোবাসা, মমত্ববোধ বৃদ্ধি করে। পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। এটি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সৃষ্টির মহামানব নবীদের (আ.) প্রতি, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি এবং ধর্মপরায়ণ নারী-পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ উজ্জীবিত করবে। মানুষ ও আল্লাহর প্রতি নিজ নিজ কর্তব্যে সচেতন করবে। তাদের সত্য ও ন্যায়ের জন্য আত্মত্যাগের শিক্ষা দেবে। এইসব গল্প প্রধানত নবীর সিরাত ও হাদিস এবং প্রখ্যাত মনীষীদের জীবনী থেকে নিতে হবে।

১৬. স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকগণ এমনভাবে মনোবিজ্ঞান, কলা ও সমাজ বিদ্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন, যাতে তারা ইসলামি তত্ত্ব প্রত্যয়ের সাথে ব্যাখ্যা করতে পারেন। তাদেরকে মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার কারণগুলো সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। এভাবে শিক্ষার তত্ত্ব ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কিত নির্দেশ প্রদানে তারা বিশেষ গুরুত্বারোপ করবেন। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে মুখস্থ, ধারা বিবরণী অথবা নোটবই এবং আধুনিক সমতুল্য একক শিক্ষা এবং মূল্যায়ন ইত্যাদির বিষয়াদি জানার জন্য তাদেরকে মূল বইয়ে উৎসাহিত করতে হবে।

১৭. প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি করে Guidance বিভাগ থাকতে হবে। এই বিভাগ গভীর আত্মবিশ্বাস ও যোগ্যতাসম্পন্ন এমন ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে, যারা ছাত্রদের ব্যক্তিগত, শিক্ষাগত, মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান ও পরিচালনায় সহায়তা করতে পারবেন।

সমাপ্ত

“

ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের কালচারে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে।
এই শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সমাজে এমন কতগুলো ম্যাকলের Brain Child এবং Brown English Man তৈরি করেছে যাদের মুখ থেকে আমরা ধর্মহীন শিক্ষার কথা শুনছি।
অথচ ইসলাম মানুষকে সত্যিকার মানবিক মর্যাদা দিয়ে তাকে সকল সৃষ্টির ওপরে প্রতিপত্তিশীল এক সৃষ্টিরূপে ঘোষণা করেছে।

-শহীদ আবদুল মালেক

”